ইউনিট
১৬

বাংলাদেশে সনাতন ধর্ম

ভূমিকা

বাংলাদেশের সংস্কৃতি বহুবিচিত্র ধারার সমন্বিত প্রকাশ। এখানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে বহুত্বের মধ্যে একত্ব।

বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্যে ধর্মগত বিভিন্নতা রয়েছে। এরা একই সাথে জাতীয় সংস্কৃতি ও নিজ নিজ ধর্মীয় সংস্কৃতি ধারণ করছেন।

এ বহু রৈখিক কিন্তু একক সংস্কৃতিকে উপলব্ধি করতে না পারলে বাঙালি তথা বাংলাদেশের জনগণের সংস্কৃতিকে, তাঁদের জীবনদর্শন ও জীবনধারাকে তার প্রকৃত রূপে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

এ কারণেই বাংলাদেশকে সামগ্রিকভাবে জানতে হলে, এর সংস্কৃতির সামগ্রিক পরিচয় গ্রহণ করতে হলে, তার অন্তর্গত বিভিন্ন ধারা-উপধারা সম্পর্কে পরিজ্ঞান আবশ্যক।

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগণের বসবাস। একই সংস্কৃতির ধারক হলেও নিজ নিজ ধর্মমতের বিশিষ্টতা তাদের স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। বাংলাদেশে প্রচলিত প্রধান ধর্মসমূহ হচ্ছে : ইসলাম ধর্ম, সনাতন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ও খ্রিষ্ট ধর্ম।

এ ইউনিটে সনাতন ধর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করে সনাতন ধর্মাবলম্বী হিন্দু সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য এবং বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে সনাতন ধর্মের উপাদান ও অবদান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ-১ : সনাতন ধর্ম : সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- সনাতন ধর্ম বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন।
- সনাতন ধর্ম ও হিন্দু ধর্ম এ ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সনাতন ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে পারবেন।
- সনাতন ধর্ম সম্পর্কে জানার উৎস হিসেবে সনাতন ধর্মের ধর্মগ্রন্থসমূহের নাম বলতে পারবেন।
- সনাতন ধর্মের দর্শন, ধর্মকৃত্য এ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

এ পাঠটিকে আমরা এ ইউনিটের পরবর্তী সকল পাঠ অধিগত করার ক্ষেত্রে প্রবেশ দ্বার হিসেবে বিবেচনা করব।

সনাতন ধর্ম

সনাতন ধর্ম একটি ধর্মমতের নাম। সারা পৃথিবীতে বিপুল সংখ্যক মানুষ সনাতন ধর্মের অনুসারী।

জীব ও জগতের উদ্ভব ও বিকাশের আদি কারণ হিসেবে, স্রষ্টা হিসেবে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরে বিশ্বাস, ঈশ্বর এক, অদ্বিতীয় ও সর্বশক্তিমান – এ ধারণা, জীবনের উদ্দেশ্য ও করণীয় প্রভৃতি বিষয়ে অতিপ্রাচীন কালে উদ্ভূত একটি বিশেষ ধর্মমতকে বলা হয় সনাতন ধর্ম।

এ ধর্মের অনুসরণে স্রষ্টার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপিত হয়, জাগ্রত হয় তাঁর প্রতি অবিচল ভক্তি। জীবের মধ্যে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর আত্মা রূপে অবস্থান করেন জেনে সকল জীবের প্রতি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ভালোবাসা জন্মে। সনাতন ধর্ম সকল ধর্মকেই সত্য বলে মানে। পার্থক্য যা তা হলো উপাসনার পদ্ধতিসহ জীবন-যাপন প্রণালীর কিছু কিছু ধারা। সনাতন ধর্ম অহিংসা, পরমত সহিষ্ণুতা ও জীবসেবার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়। এতে করে মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে ধর্মমতসহ মত ও পথের বিভিন্নতা থাকলেও মানুষ হিসেবে দেখার বোধ জন্মে। জীবে ঈশ্বরবোধ সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সংহতির চেতনা জাগ্রত করে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংহতির প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং সাম্প্রদায়িক ও সংকীর্ণ ভেদবুদ্ধির ঊর্ধ্বে উঠতে সহায়তা করে।

সনাতন ধর্ম ও হিন্দুধর্ম

'সনাতন' শব্দটির অর্থ 'চিরন্তন'– যা পূর্বে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। সুতরাং সনাতন ধর্ম বলতে বোঝায়, যে ধর্ম পূর্বে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এ কথার মধ্য দিয়ে সনাতন ধর্মের চিরন্তনতা প্রকাশ পায়। তবে তার মানে এই নয় যে সনাতন ধর্ম অবিকল পূর্বের মতোই আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এ কথার তাৎপর্য এই যে সনাতন ধর্ম যুগ যুগ ধরে যুগাগত বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে এগিয়ে চলেছে ভবিষ্যতের পথে। সনাতন ধর্মের মূলীভূত বৈশিষ্ট্য অবিকৃত রয়েছে, তার প্রকাশরূপে ঘটেছে নানা পরিবর্তন, যুগাগত প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রেখে পরিমার্জন ও সংযোজনের মধ্য দিয়ে সনাতন ধর্ম এগিয়ে চলছে ।

সনাতন ধর্মকে তার এগিয়ে চলার পথে নানা মত ও পথের মধ্যে সমন্বয় ও সংহতি ঘটাতে হয়েছে। সনাতন ধর্ম তাই প্রাচীন হয়েও নবীন। আবার নবীন হয়েও তা বহু যুগাগত ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। এ গতিশীলতা ও চিরসজীবতার জন্যই এ ধর্মটিকে বলা হয়েছে সনাতন ধর্ম।

সনাতন ধর্ম হিন্দু ধর্ম নামেও বহুল পরিচিত। 'হিন্দু' নামটি মূলত পারস্যবাদীদের (বর্তমান ইরান) দেওয়া। পারস্যবাসীরা 'স' স্থানে 'হ' উচ্চারণ করেন। তাই তাঁদের উচ্চারণে 'সিন্ধু' হয়েছে 'হিন্দু'। আর সিন্ধু নদের অববাহিকায় যাঁরা বসবাস করতেন তাঁরাও হিন্দু নামে অভিহিত হন। তাই সনাতন ধর্মাবলম্বীরাও তাঁদের কাছে 'হিন্দু' বলে বিবেচিত। এ হিন্দুদের সনাতন ধর্মকে তাঁরা হিন্দুধর্ম বলেছেন।

সুতরাং সনাতন ধর্ম ও হিন্দুধর্ম একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা পরিষ্কারভাবে বোঝাবার জন্য বলতে পারি : এ উপমহাদেশের সনাতন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের নাম হিন্দু সম্প্রদায়। এ হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্ম হচ্ছে সনাতন ধর্ম। প্রসারিত অর্থে যিনি সনাতন ধর্মে বিশ্বাস করেন তিনিই সনাতন ধর্মী। প্রচলিত অর্থে হিন্দুধর্ম বললে সনাতন ধর্মকেই বোঝায়।

সনাতন ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ

অতি প্রাচীন কালে সনাতন ধর্মের উদ্ভব। ঠিক কখন সনাতন ধর্মের উদ্ভব ঘটেছে, তার পূর্ণ ইতিহাস আজও অজ্ঞাত। বহু ঋষির, মুনির ও মনীষীর ধ্যানে, মননে, সাধনায় সনাতন ধর্মদর্শন, ধর্মকৃত্য ও ধর্মাদর্শ উদ্ভূত ও বিকশিত হয়ে এসেছে। তাই সনাতন ধর্মের কোনো একক প্রবর্তকের নাম উল্লেখ করা হয় নি। প্রাচীন যুগ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কাল পর্যন্ড় নানা মত ও পথের সমন্বয় সাধন করে সনাতন ধর্ম বিকশিত হয়ে চলেছে।

সনাতন ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থাবলি

বহুকাল ধরে বহু মনীষীর সমন্বিত প্রচেষ্টায় সনাতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ। তাই সনাতন ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থাবলির সংখ্যাও অনেক। কালের ধারায় সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান যে ধর্মগ্রন্থগুলোর উদ্ভব ঘটেছে, তার নাম বেদ। বেদ চারটি : ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। এগুলোর একেকটিকে বলা হয় সংহিতা। যথা– ঋগ্বেদসংহিতা, সামবেদসংহিতা, যজুর্বেদসংহিতা এবং অথর্ববেদসংহিতা।

এ চার বেদের পরবর্তী কালের ধর্মগ্রন্থগুলোর নাম ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ গ্রন্থের সংখ্যাও অনেক। যেমন– কৌষীতকী ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রাহ্মণ, তান্ড্য ব্রাহ্মণ, গোপথ ব্রাহ্মণ ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণের সঙ্গেই জড়িত আরও দুরকমের ধর্মগ্রন্থ : আরণ্যক ও উপনিষদ। আরণ্যকও অনেকগুলো। যেমন– ঐতরেয় আরণ্যক, তৈত্তিরীয় আরণ্যক ইত্যাদি। উপনিষদও অনেকগুলো। যেমন– ঈশ উপনিষদ, কঠ উপনিষদ, মন্ডূক উপনিষদ, মান্ডূক্য উপনিষদ, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ইত্যাদি।

অতঃপর রচিত হয়েছে ছয়টি বেদাঙ্গ : শিক্ষা (উচ্চারণ তত্ত্ব ও প্রয়োগ), কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দ ও জ্যোতিষ। এগুলো বেদ পাঠের সহায়ক। এরপর সূত্র গ্রন্থাবলি রচিত হয়েছে। যেমন– কল্পসূত্র, গৃহ্যসূত্র ইত্যাদি।

তারপরের ধর্মগ্রন্থগুলো হচ্ছে রামায়ণ ও মহাভারত। এ ধর্মগুলোর মধ্যে কাব্য ও ইতিহাসের সংমিশ্রণ ঘটেছে। মহাভারতের একটি অংশ হয়েও পৃথক ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ সংকলিত – যা জীবনে চলার পথে সহায়ক। এ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নামক ধর্মগ্রন্থটি সনাতনধর্মাবলম্বীদের নিত্যপাঠ্য গ্রন্থ।

অনেককাল ধরে রচিত হয়েছে 'পুরাণ' নামক একগুচ্ছ ধর্মগ্রন্থ। আঠারোটি পুরাণ, আঠারোটি উপপুরাণ এবং আঠারোটি উপ-উপপুরাণ রয়েছে। আঠারোটি পুরাণের মধ্যে রয়েছে ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণ, মার্কন্ডেয় পুরাণ, অগ্নিপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ ইত্যাদি। মার্কন্ডেয় পুরাণের অংশ হয়েও পৃথক ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে শ্রীশ্রীচন্ডী। দুর্গাপূজাসহ বেশ কিছু ধর্মানুষ্ঠানে শ্রীশ্রীচন্ডী পাঠ করা হয়। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণও নিয়মিত পাঠ করা হয়।

আরও একগুচ্ছ ধর্মগ্রন্থ রয়েছে যেগুলোর নাম 'তন্ত্র'।

শ্রীচৈতন্যদেবের মাহাত্ম্য প্রকাশক একটি ধর্মগ্রন্থের নাম শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

এ সকল ধর্মগ্রন্থ ছাড়াও রয়েছে কিছু স্মৃতিগ্রন্থ। এগুলোও ধর্ম পালন ও জীবনাচরণের সহায়ক। মনুসংহিতা, পরাশরসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থ সনাতন ধর্মাবলম্বীরা অনুসরণ করেন।

সনাতন ধর্মদর্শন

সনাতন ধর্ম গ্রন্থ বহু হলেও এগুলোর মধ্যে দর্শনগত সমন্বয় ঘটেছে। বিশ্বব্রহ্মান্ডের আদি স্রষ্টা রূপে যাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়, সনাতন ধর্মাবলম্বীরা তাকে 'ব্রহ্ম' বলেন। ব্রহ্ম নিরাকার, ব্রহ্ম অদ্বিতীয়। তাই উপনিষদে বলা হয়েছে একমেবাদ্বিতীয়ম্। ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়।

এই ব্রহ্মের স্বরূপও বিশে- ষণ করা হয়েছে। ব্রহ্ম বিশ্বব্রহ্মান্ডের ওপর প্রভুত্ব করেন। তাই ব্রহ্মকে বলা হয়েছে ঈশ্বর। 'ঈশ্বর' মানে প্রভু।

সনাতন ধর্মাবলম্বীরা ঈশ্বরের বিচিত্র রূপ ও স্বরূপের মাহাত্ম্য কীর্তন করে নানাভাবে তাঁর উপাসনা করেন। নানা রূপে নানা পথে উপাসনা করলেও ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। এটা সনাতন ধর্মের ভিত্তি এবং সনাতন ধর্মাবলম্বীরা একেশ্বরবাদী।

এক ঈশ্বরই বহুরূপে প্রতিভাত হয়েছেন। ঈশ্বর যখন জীব তথা ভক্তকে কৃপা করেন তখন তাকে ভগবান বলা হয়।

পৃথিবীতে অনেক সময় অশান্তির দেখা দেয়। দেখা দেয় অরাজকতা। দুর্বৃত্তেরা দেখায় শক্তিদম্ভ। সজ্জনেরা উৎপীড়িত হন। ধর্ম তথা ন্যায় বিচার বিঘ্নিত হয়। তখন দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এবং ধর্ম তথা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ঈশ্বর জীবরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। অবতীর্ণ হন বলে তখন ঈশ্বরকে অবতার বলা হয়। যেমন– নৃসিংহ, বামন, রাম। তবে ভগবান

সরাসরি শ্রীকৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাই বলা হয় 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। তাই শ্রীকৃষ্ণকে কেবল অবতার না বলে বলা হয় মহা-অবতারী।

আবার ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের কোনো একটি বিশেষ গুণ বা শক্তিকে বলা হয় দেবতা বা দেব-দেবী। যেমন– যে রূপে ঈশ্বর সৃষ্টি করেন, তাঁর নাম ব্রহ্মা। সুতরাং ব্রহ্ম আর ব্রহ্মা এক কথা নয়। ব্রহ্ম নিরাকার মূল সত্তা। আর ব্রহ্মা তার সৃষ্টি শক্তির রূপধারী। ব্রহ্ম পূর্ণ। ব্রহ্মা তার অংশ।

ঈশ্বর যে রূপে জীবজগতকে পালন করেন তাঁকে বলা হয় বিষ্ণু। বিষ্ণু ব্রহ্মের পালন শক্তি। আবার ব্রহ্ম যে রূপে ধ্বংস করে সৃষ্টির মধ্যে লয় বা ভারসাম্য রক্ষা করেন, তখন তাঁকে বলা হয় শিব।

ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের শক্তি বা প্রকৃতির নাম আদ্যাশক্তি বা মহামায়া। এ মহামায়ারও অনেক রূপ। যেমন– দুর্গা, কালী, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি।

ঈশ্বর যে রূপে বিদ্যা দান করেন, তিনি দেবী সরস্বতী। ব্রহ্মের ধন-সম্পদ প্রদানের শক্তি বা গুণের নাম লক্ষ্মী।

এ রকম অনেক দেব-দেবী আছেন। দেব-দেবীরা পূর্ণ ঈশ্বর নন। তাঁরা ঈশ্বরের কোনো বিশেষ গুণ বা শক্তি।

আবার জীবের মধ্যে আত্মা রূপেও ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই বিরাজ করেন। তাই জীবের সেবা করলে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের সেবা করা হয়। ব্রহ্মই জগতের সর্বত্র বিরাজিত। তাই একজন কবি ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলেছেন:

আছ অনল-অনিলে চির নভোনীলে
ভূধর-সলিল-গহনে,
আছ বিটপি-লতায় জলদের গায়
শশী তারকায় তপনে।

(রজনীকান্ত সেন)

স্বামী বিবেকানন্দ চমৎকার করে বলেছেন : ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়।
সুতরাং ব্রহ্ম বা ঈশ্বর থেকে শুরু করে অবতার, দেব-দেবী, জীব ও জগৎ মিলিয়ে এক পরম ব্রহ্ম, এক পরমসত্তা। অদ্বিতীয় ঈশ্বর। 'এক' থেকে 'বহু' আবার বহুকে মিলিয়ে এক অনাদি অনন্ত পরম ব্রহ্ম।
সনাতন ধর্মের এ ব্রহ্মতত্ত্ব তথা একেশ্বরবাদটি না বুঝলে মনে হবে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা বহু ঈশ্বরবাদী। এ চিন্তা থেকে জাত সিদ্ধান্ড় হবে বিভ্রান্তিকর এবং সনাতন ধর্মদর্শনের ভুল ব্যাখ্যা। তাই সনাতন ধর্মের এ ব্রহ্মতত্ত্বমূলক ধর্মদর্শনটিকে আমরা সহজভাবে বুঝে নিলাম। এখন আর বিভ্রান্ড় হব না। প্রকৃত সত্য আমাদের চিন্ড়ায় উদ্ভাসিত থাকবে। সনাতন ধর্মদর্শনে জন্মান্ড়রবাদ কর্মফল, পাপপুণ্য, স্বর্গ-নরক প্রভৃতি বিষয়ে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সনাতন ধর্মকৃত্য

সনাতন ধর্মাবলম্বীরা ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, অবতার ও দেব-দেবীদের উপাসনা করেন। সেই স্রষ্টার কাছে তাঁরই সৃষ্টি রূপে কৃতজ্ঞতা জানানোর, প্রার্থনা জানানোর উপায় হচ্ছে উপাসনা।
সনাতন ধর্ম অনুসারে উপাসনা দু প্রকার: নিরাকার উপাসনা ও সাকার উপাসনা।

নিরাকার উপাসনা

নিরাকার ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে স্তব-স্তুতি উচ্চারণ করে, তাঁর নাম জপ করে, তাঁর নাম সরবে কীর্তন করে যে উপাসনা তা নিরাকার উপাসনা।

সাকার উপাসনা

অবতার ও দেব-দেবীর প্রতিমা নির্মাণ করে, পুষ্প, পত্র, ধূপ, দীপ ও ভোজ্য নৈবেদ্য দিয়ে, প্রতিমার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের শক্তি বিশেষের যে উপাসনা তাকে বলা হয় সাকার উপাসনা। এভাবে সাকার উপাসনার নাম পূজা। নিজ গৃহে পূজা করা যায়। আবার সকলে মিলে পূজা করার জন্য দেবতার মন্দির নির্মাণ করে বিগ্রহ বা প্রতিমাকে সেখানে স্থাপন করা হয়। আয়োজন করা হয় ধর্মোৎসবের। নির্মিত প্রতিমার মধ্য দিয়ে ব্রহ্মের শক্তি বিশেষের পূজা করে সেই শক্তি অর্জনের যে প্রার্থনা তারই নাম সাকার উপাসনা।

নিরাকার ও সাকার দুভাবেই ঈশ্বরের বা তাঁর কোনো শক্তিকে (দেব/দেবীকে) উপাসনা করা যায়।

উপাসনা ছাড়াও জন্ম থেকে শুরু করে, শিক্ষা ও মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত জীবনে ধর্মকৃত্য রূপে কিছু কৃত্য পালন করতে হয়। সেগুলিও ধর্মের অঙ্গ। গঙ্গা বা পবিত্র নদীতে স্নান, তীর্থভ্রমণ প্রভৃতিও সনাতন ধর্মকৃত্যের অন্তর্গত। ধর্মকৃত্যসমূহের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় ধর্মাচার। ধর্মাচার ধর্মের প্রকাশরূপ।

সনাতন ধর্মাদর্শ

সনাতন ধর্মাদর্শ বলতে বোঝায় ধর্ম পালন করলে কী ফল লাভ করা যায়। ঈশ্বরে বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ধর্ম পালন ধর্ম নির্দিষ্ট কর্তব্য। এ কর্তব্য পালন করলে ব্রহ্ম কর্তৃক সৃষ্ট জীব যে আত্মা রূপে ব্রহ্মকে ধারণ করে আছে, সেই জীবাত্মা ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিত হয়ে ব্রহ্মে লীন হয়ে যেতে পারে। একে বলে মোক্ষ। ধর্মপালন করা আমাদের কর্তব্য কেন? সনাতন ধর্মদর্শনে বলা হয়েছে, ধর্মপালন করা হয়, 'আত্মমোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ'। অর্থাৎ ধর্ম পালন করা হয় নিজের মোক্ষ বা চিরমুক্তি এবং জীব-জগতের কল্যাণের জন্য। কেবল নিজের মোক্ষের কথা ভাবলেই ধর্ম পালন করা হবে না। তার সঙ্গে জীব-জগতের হিত বা মঙ্গলের জন্য সেবামূলক কর্মে লিপ্ত হতে হবে। এই হলো সনাতন ধর্মাদর্শ।

যেহেতু জীবের মধ্যে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর জীবাত্মা রূপে বিরাজ করছেন, তাই ব্রহ্মজ্ঞানে জীবের সেবা করতে হবে। তাহলে ঈশ্বরের সেবা করা হবে। বহু জীবের মধ্যে বহু রূপে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর আমাদের সম্মুখেই আছেন। সেই জীবব্রহ্মের সেবা করতেই হবে। এ নৈতিক শিক্ষা সনাতন ধর্মাদর্শের একটি মৌলিক বিশ্বাস। স্বামী বিবেকানন্দ চমৎকার করে বুঝিয়েছেন:

বহু রূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?

জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

এ সনাতন ধর্মাদর্শ অনুসরণ করলে সমাজে হিংসা, স্বার্থপরতা কিছুই থাকবে না, সমাজ হবে শান্তিময় আনন্দময়।

পাঠ সংক্ষেপ

'সনাতন ধর্ম' একটি ধর্মমতের নাম। পৃথিবীতে বিপুল সংখ্যক মানুষ সনাতন ধর্মের অনুসারী। সনাতন ধর্মের অপর নাম হিন্দুধর্ম। সনাতন ধর্ম অতি প্রাচীন কালে উদ্ভূত। বহু মত ও পথ সনাতন ধর্মে সমন্বিত। তাই সনাতন ধর্মের প্রবর্তক হিসেবে কোনো একক প্রবর্তকের নাম উল্লেখ করা হয় না। সুদূর অতীত কালে উদ্ভূত হয়ে সনাতন ধর্ম বিকশিত হয়ে চলেছে। তবে মূল চিন্তা থেকে তা দূরে সরে যায় নি। বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, রামায়ণ মহাভারত, পুরাণ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীশ্রীচন্ডী প্রভৃতি সনাতন ধর্মের গ্রন্থাবলির অন্তর্ভূত। এ সকল ধর্মগ্রন্থে সনাতন ধর্মদর্শন, ধর্মকৃত্য ও ধর্মাদর্শ বর্ণিত হয়েছে। সনাতন ধর্মের ভিত্তি একেশ্বরবাদ। একই ব্রহ্ম ঈশ্বর, ভগবান ও অবতার রূপে উপাসিত। দেব-দেবীরাও ব্রহ্মের অংশ। আবার আত্মা রূপে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। সব মিলিয়ে এক ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। জন্মান্তরবাদ ও কর্মফল সনাতন ধর্মের অন্যতম বিশ্বাস।

নিরাকার ও সাকার উপাসনার মধ্য দিয়ে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মকৃত্য প্রকাশিত হয়। আত্মমোক্ষ ও জীবজগতের হিতসাধন হচ্ছে সনাতন ধর্মের আদর্শ। জীবকে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর জ্ঞানে সেবা করা সনাতন ধর্মের অন্যতম ধর্মাদর্শ ও শিক্ষা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১. সনাতন ধর্মের অপর নাম কী

ক. হিন্দুধর্ম — খ. সিন্ধু ধর্ম

গ. আর্যধর্ম — ঘ. শৈব ধর্ম

২. 'সনাতন' শব্দটির অর্থ কী?

ক. সত্য — খ. চিরন্তন

গ. অনন্ত — ঘ. অনাদি

৩. সনাতন ধর্মের প্রবর্তক কে?

ক. ব্রহ্মা — খ. শিব

গ. শ্রীচৈতন্য — ঘ. একক কোনো ব্যক্তি নন

৪. বেদ কয়টি?

ক. একটি — খ. দুটি

গ. তিনটি — ঘ. চারটি

৫. 'ঈশ' কোন শ্রেণির ধর্মগ্রন্থ?

ক. বেদ — খ. ব্রাহ্মণ

গ. উপনিষদ — ঘ. আরণ্যক

৬. একটি ধর্মগ্রন্থের অংশ হয়েও পৃথক ধর্ম গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে কোন ধর্ম গ্রন্থটি?
ক. কঠ উপনিষদ খ. শ্রীমদ্ভাগবত
গ. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ঘ. শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

৭. নিচের কোনটি অবতারের নাম?
ক. দুর্গা খ. ইন্দ্র
গ. নৃসিংহ ঘ. চন্দ্র

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. টীকা লিখুনঃ
(ক) বেদ (খ) ব্রাহ্মণ (গ) উপনিষদ

২. ব্রহ্ম ও ব্রহ্মার মধ্যে পার্থক্য কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সনাতন ধর্ম বলতে কী বোঝেন? সনাতন ধর্ম ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কী? বুঝিয়ে লিখুন।
২. সনাতন ধর্ম গ্রন্থাবলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
৩. সংক্ষেপে সনাতন ধর্মদর্শনের পরিচয় তুলে ধরুন।
৪. সনাতন ধর্মাদর্শের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

পাঠ-২ : ধর্মতত্ত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- ধর্ম কী তা বলতে পারবেন।
- ধর্মের সাধারণ ও বিশেষ লক্ষণ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ধর্ম অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

ধর্ম

যার ধারণ শক্তি আছে তার নাম ধর্ম। সংস্কৃত 'ধৃ' ধাতুর সঙ্গে 'মন্' প্রত্যয় যোগ করে ধর্ম শব্দটি গঠন করা হয়েছে। আমরা জানি প্রত্যেক বস্তুরই ধর্ম আছে। যেমন আগুনের ধর্মদহন করা। জলের ধর্ম শীতলতা। মানুষের ধর্ম মনুষ্যত্ব। প্রকৃত মনুষ্যত্ব না থাকলে সে পশুসমতুল্য, তাকে যথার্থ মানুষ বলা যাবে না।

আবার ধর্ম মানে ন্যায়। ধর্ম মানে বিধি-বিধান। ধর্ম শব্দটির আরও অর্থ আছে। যেমন ধর্ম মানে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে বিশেষ পদ্ধতিতে উপাসনা। ধর্মের আরেকটি অর্থ হচ্ছে সংস্কৃতি। সব মিলিয়ে ধর্ম কথাটি যে অর্থে আমরা এখানে ব্যবহার করছি তা হচ্ছে একটি বিশিষ্ট মূল্যবোধ ও জীবনে চলার পথে বিশেষ নির্দেশিকা।

মনুসংহিতায় ধর্মের সাধারণ লক্ষণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে :

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ
স্বস্য প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ
সাক্ষাৎ ধর্মস্য লক্ষণম্ ॥

– বেদ, স্মৃতিশাস্ত্র, সদাচার ও বিবেকের বাণী – এ চারটি হচ্ছে ধর্মের সাক্ষাৎ বা সাধারণ লক্ষণ। এ চারটিকে ক্রমান্বয়ে অনুসরণ করে ধর্মের স্বরূপ তথা ধর্মাধর্ম নির্ণয় করতে হয়।

বেদ

বেদ সনাতন ধর্মের আদি ধর্ম গ্রন্থ। বেদ শব্দটির মানে হচ্ছে জ্ঞান – পবিত্র জ্ঞান। প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের কাছে ঈশ্বরের যে বাণী প্রতিভাত হয়েছিল, তা বেদে সংগৃহীত হয়েছে। আমরা জানি, বেদ চারটি – ঋগ্‌বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ। ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বেদই প্রথম নির্ভরযোগ্য প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

স্মৃতিশাস্ত্র

বেদের অপর নাম শ্রুতি। বেদের পরে ধর্মাধর্ম বা কর্তব্য-অকর্তব্য বিষয়ের নির্দেশ রূপে রচিত হয়েছে স্মৃতিশাস্ত্র। যেমন– মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, পরাশরসংহিতা ইত্যাদি।

সদাচার

বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্র ছাড়াও ধর্মাধর্মের তৃতীয় প্রমাণ হচ্ছে সদাচার। সদাচার হচ্ছে সাধু-সজ্জন-মহাপুরুষদের আচরণ বা উপদেশ। তাঁদের আচরণ বা উপদেশ অনুসারেও ধর্মাধর্ম নির্ণয় করা যায়।

বিবেকের বাণী

বেদ, স্মৃতি ও সদাচার ছাড়াও নিজের বিবেক অনুসারে ধর্মাধর্ম নির্ণয় করা বা কর্তব্যকর্ম স্থির করা যায়। নিজের বা অন্য ব্যক্তির কিংবা সমাজের সমষ্টিগত ক্ষতি বা কষ্টের কারণ হয় এমন কাজ করা উচিত নয়। বিবেক আমদের মধ্যে সেই কল্যাণ ভাবনা জাগ্রত করে। ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে পক্ষপাত শূন্য ও সুবুদ্ধিযুক্ত বিবেককেও তাই ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে চতুর্থ প্রমাণরূপে বিবেচনা করা হয়েছে।

মনুসংহিতায় ধর্মের বিশেষ লক্ষণ হিসেবে দশটি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে :

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং
শৌচমিন্দ্রিয়মনিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো
দশকং ধর্মলক্ষণম্ ॥

– সহিষ্ণুতা বা ধৈর্য, ক্ষমা, আত্মসংযম, চুরি বা অপহরণ না করা, শুচিতা বা পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, প্রজ্ঞা, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ – এ দশটি ধর্মের বিশেষ লক্ষণ।

ধর্ম অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা

ধর্ম অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে :

'যতোবাহভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি স ধর্মঃ।'

– যা থেকে 'অভ্যুদয়' ও 'নিঃশ্রেয়স' অর্জিত হয়, তাকে ধর্ম বলা হয়। এখানে 'অভ্যুদয়' বলতে জাগতিক কল্যাণ এবং 'নিঃশ্রেয়স' বলতে বোঝায় নিশ্চিত কল্যাণ। ধর্ম পালন করলে ইহলোকে উন্নতি হয় এবং পরলোকে মোক্ষলাভ হয়।

এ বিষয়ে মনুসংহিতাতে বলা হয়েছে :

ধর্ম এব হতো হন্ডি় ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।

তস্মাদ্ধর্মো ন হন্ড়ব্যো মা নো ধর্মো হতোহবধীৎ ॥

– ধর্ম নষ্ট হলে ধর্ম নষ্টকারীর বিনাশ ঘটে। আর ধর্ম রক্ষিত হলে ধর্মই তার রক্ষাকারীকে রক্ষা করে। তাই কখনও ধর্ম নষ্ট করা উচিত নয়। ধর্ম নষ্ট হয়ে যেন আমদের বিনষ্টি না ঘটায়।

সুখে হোক আর দুঃখেই হোক সব সময় ধর্ম রক্ষা করে চলতে হবে। ধর্ম পথে থাকতে হবে।

আমরা মনে রাখব ধর্মবিশ্বাস, ধর্মাচার ধর্মানুষ্ঠান – এ তিনে মিলে ধর্মের প্রাণ।

ধর্মের আরেকটি অর্থ হচ্ছে জগতের কল্যাণ কথা জীবসেবা। ধর্ম কেবল কিছু ধর্মানুষ্ঠান করা বা ধর্মাচার পালন করা নয়, কেবল আত্মমোক্ষ নয়, ধর্মের উদ্দেশ্য জীব ও জগতের কল্যাণ।

ভাগবতে বলা হয়েছে, যা থেকে ঈশ্বরে ভক্তি জন্মে, তার নামও ধর্ম। ঈশ্বরে ভক্তি থেকে মানুষের আত্মা প্রসন্নতা ও মুক্তি লাভ করে। ধার্মিক ব্যক্তি তাই সদানন্দ। সুখ ও দুঃখে তিনি থাকেন অবিচল।

কালের গতিতে সমাজ ও জীবনের ক্ষেত্রে নানা পরিবর্তন ঘটে। তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হয়। যুগাগত বাস্তবতাকেও বিবেচনায় নিতে হয়। তাই ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠানেও কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে। সেসবের উপযোগী করে ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠানে করণীয়, শাস্ত্রেই বলা হয়েছে–

কেবলশাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।

যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে ॥

অর্থাৎ কেবল শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে চললেই ধর্ম রক্ষা হয় না। সর্বক্ষেত্রে যুক্তি ব বাস্তবতা মেনে চলতে হবে। কারণ যুক্তিহীন বিচারে ধর্মহানি ঘটে থাকে।

এখানেই সনাতন ধর্মের গতিশীল বৈশিষ্ট্য নিহিত। সনাতন ধর্ম তাই প্রাচীন হয়েও চির নবীন, নবীন হয়েও মূলীভূত ঐতিহ্যেরও ধারক-বাহক।

পাঠ সংক্ষেপ

যা আমাদের ধারণ করে রাখে তার নাম ধর্ম। বেদ, স্মৃতিশাস্ত্র, সদাচার ও বিবেকার বাণী – এ চারটি ধর্মের সাধারণ লক্ষণ। ধর্মের ধৃতি, ক্ষমা, দম প্রভৃতি দশটি বিশেষ লক্ষণও রয়েছে। ধর্ম বলতে ন্যায় বিচার, নীতি এবং সংস্কৃতিও বোঝায়। ধর্ম অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে জাগতিক কল্যাণ ও মোক্ষলাভ। ধর্ম নষ্টকারীকে নষ্ট করে, রক্ষাকারীকে রক্ষা করে। যুগাগত সত্যকে মেনে ধর্মাচারে ও ধর্মবোধে পরিবর্তনও ঘটাতে হয়। যুক্তিহীন বিচারে ধর্মহানি ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১. ধর্মের সাক্ষাৎ বা সাধারণ লক্ষণ কয়টি?

ক. একটি　　খ. দুটি
গ. তিনটি　　ঘ. চারটি

২. সনাতন ধর্মের আদি ধর্ম গ্রন্থ কী?
ক. বেদ খ. স্মৃতিশাস্ত্র
গ. পুরাণ ঘ. মহাভারত

৩. ধর্মের বিশেষ লক্ষণ কয়টি?
ক. চারটি খ. ছয়টি
গ. আটটি ঘ. দশটি

৪. ধর্ম থেকে অর্জিত হয় –
ক. অভ্যুদয় খ. টাকা পয়সা
গ. সম্মান ঘ. বিদ্যা

৫. ধার্মিক ব্যক্তি সব সময় কেমন থাকেন?
ক. মৌন খ. ধ্যানস্থ
গ. সদানন্দ ঘ. বিষণ্ন

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. "'ধর্ম' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।" – এ কথাটি ব্যাখ্যা করুন।
২. বিবেকের বাণীকেও ধর্ম বলা হয়েছে কেন?
৩. 'যুক্তিহীন বিচারে ধর্মহানি ঘটে।' – কথাটি বুঝিয়ে দিন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ধর্মের চারটি সাধারণ লক্ষণের বর্ণনা দিন।
২. ধর্মের প্রয়োজনীয়তা কী? সংক্ষেপে লিখুন।

পাঠ–৩ : জন্মান্ড়রবাদ ও কর্মফল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- জন্মান্তরবাদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- দেহ ও আত্মার মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।
- জন্মান্তর প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জন্মান্তর ও কর্মফলের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

জন্মান্তর ও জন্মান্তরবাদ

সনাতন ধর্ম বলে যখন জীবদেহে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা অবস্থান করেন, তখন তাকে আত্মা বা জীবাত্মা বলা হয়। যেহেতু জীবাত্মা ব্রহ্ম বা পরমাত্মার অংশ তাই জীবাত্মার ধ্বংস নেই। জীবাত্মা অবিনশ্বর। ধ্বংস হয় দেহ। মৃত্যু মানে জীবাত্মার দেহ আধারটির পরিত্যাগ।

মানুষ যে কর্ম করে, সে কর্মের ফল মানুষকে ভোগ করতে হয়। কখনও কখনও এ জন্মের কর্মের ফল এই জন্মেই শেষ হয়ে যায়। আবার এ জন্মের কর্মের ফল এ জন্মে আংশিকভাবে ভোগ করা হলো, অবশিষ্ট অংশের ভোগ অসমাপ্ত রইল। তা ভোগ করার জন্য ঐ জীবাত্মাকে আবার পৃথিবীতে জন্ম নিতে হবে। আবার এ জন্মের কর্মফল ভোগই করা হলো না, তাহলে পরবর্তী জন্মে তা ভোগ করতেই হবে। এই যে একবার জন্মগ্রহণ করে মৃত্যুর পর আবার জন্ম গ্রহণ, তাকেই বলে জন্মান্ড়র। অন্য জন্ম = জন্মান্তর।

এ প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলেছেন:

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্য -
ন্যানি সংযতি নবানি দেহী ॥
(২/১৪)

অর্থাৎ মানুষ যেমন পুরাতন বসন পরিত্যাগ করে নতুন বসন পরিধান করে, তেমনি আত্মা জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করে অন্য নতুন দেহ ধারণ করে।

জন্মান্তর সম্পর্কিত এ তত্ত্বকে জন্মান্তরবাদ বলা হয়।

দেহ ও আত্মার সম্পর্ক

দেহ ও আত্মার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। দেহহীন আত্মা নিরাকার। তাঁকে দেখা যায় না। আত্মাকে লাভ করে দেহ সজীব ও সচল হয়। আত্মা দেহ ছেড়ে গেলে দেহ আবার অচল ও নির্জীব হয়ে যায়। তাকেই বলা হয় মৃত্যু।

আত্মাহীন দেহ জড়। আবার দেহকে আশ্রয় করে আত্মার অভিযাত্রা। আগেই বলেছি আত্মার এক দেহ ত্যাগ এবং নতুন দেহ ধারণের নামই জন্মান্তর।

সাধনার দ্বারা জন্মান্তর বোধ করে মোক্ষলাভ বা ব্রহ্মে জীবাত্মাকে লীন করে দেওয়া যায়। কিন্তু যতদিন পর্যন্ড় তা হচ্ছে না, ততদিন জন্ম গ্রহণ করতে হবে এবং অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে। জীব এ জন্ম ও মৃত্যুর চক্রে বাঁধা। মোক্ষলাভ বা চিরমুক্তির পূর্বপর্যন্ত জীবকে এ চক্রের আবর্তনে আবর্তিত হতে হবেই।

জন্মান্ড়র ও কর্মফল

জন্মান্ড়রের সঙ্গে কর্মফলের সম্পর্ক রয়েছে। কর্মফলের তত্ত্বকে কর্মবাদ বলা হয়। কর্মবাদের মূল কথা হচ্ছে, বিশ্বজগৎ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের প্রধান কর্মক্ষেত্র। এখানে জীবাত্মা ভাবনা, বাসনা ও চেষ্টার দ্বারা বিভিন্ন কর্ম করে যাচ্ছে। প্রত্যেকটি কর্মের রয়েছে পৃথক পৃথক ফল। সনাতন ধর্মদর্শন বলে কর্ম করলেই তার ফল উৎপন্ন হবে। আর কর্মকর্তাকে কর্ম থেকে উৎপন্ন ফল ভোগ করতে হবে।

কর্ম দু প্রকার : সকাম কর্ম ও নিষ্কাম কর্ম। সকাম কর্ম কামনাযুক্ত। কর্মটি আমার, আমার কর্ম আমি করি, ফলাফলের ভাগীও আমি। – এই হল সকাম কর্ম। সকাম কর্ম করলে তার ফল ভোগ করার জন্য জন্মান্তর ঘটবে।

তবে নিষ্কাম কর্ম করলে কর্মের যে ফল উৎপন্ন হবে কর্মকর্তাকে তা ভোগ করতে হবে না। নিষ্কাম কর্ম হচ্ছে কামনাশূন্য কর্ম।

আমরা যত কর্ম করি সবই ঈশ্বরের কাজ। ফলাফলও ঈশ্বরের। অর্থাৎ ঈশ্বর আমাকে দিয়ে তাঁর কাজ করাচ্ছেন। ফলাফলের দায়িত্ব আমার নয়, ঈশ্বরের। এ রকম কর্মই নিষ্কাম কর্ম। নিষ্কাম কর্মের বৈশিষ্ট্য হচ্ছেঃ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ, কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ এবং কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ।

নিষ্কাম কর্ম করে জীব মোক্ষলাভ করতে পারে। তখন আর তার জন্ম নিতে হবে না।

জন্মান্তরবাদ ও কর্মফল বা কর্মবাদ সনাতন ধর্মের মূলীভূত বিশ্বাসের অন্তর্গত।

পাঠ সংক্ষেপ

আত্মা বা জীবাত্মা দেহ ধারণ করলে দেহ সচল ও সজীব হয়। আত্মা যখন দেহ ত্যাগ করে, তখন দেহ জড় হয়ে যায়। তারই নাম মৃত্যু। মৃত্যুতে দেহ ধ্বংস হয়, আত্মা নয়। আত্মার ধ্বংস নেই। তবে কর্মফল ভোগের জন্য জীবাত্মাকে বারবার জন্ম নিতে হয়। একে বলে জন্মান্তর। আর জন্মান্তর সম্পর্কিত তত্ত্বকে বলে জন্মান্তরবাদ।

জন্মান্তরবাদের সঙ্গে কর্মফল বা কর্মবাদের সম্পর্ক রয়েছে। সকাম কর্ম করলে জন্মান্তরের চক্রে আবর্তিত হতে হয়। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম করে অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ, কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ ও কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করলে জীবনে জন্মান্তর চক্রে আবর্তিত হতে হয় না, তখন জীব মোক্ষ বা চিরমুক্তি লাভ করে ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিনঃ

১. পরমাত্মা যখন জীবদেহে অবস্থান করেন, তখন তাকে কী বলে?
   ক. প্রভু — খ. ঈশ্বর
   গ. জীবাত্মা — ঘ. দেবতা

২. নিম্নলিখিত কোনটির ধ্বংস হয়?
   ক. ব্রহ্মের — খ. পরমাত্মার
   গ. জীবাত্মার — ঘ. দেহের

৩. আত্মার দেহ ছেড়ে চলে যাওয়ার নাম কী?
   ক. জন্মান্তর — খ. ব্রহ্মলাভ
   গ. মৃত্যু — ঘ. পুনর্জন্ম

৪. ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কর্ম করাকে কী বলে?
   ক. সকাম কর্ম — খ. নিষ্কর্ম
   গ. অকর্ম — ঘ. নিষ্কাম কর্ম

৫. মোক্ষলাভের উপায় কী?
   ক. দীর্ঘ জীবন — খ. পূজা করা
   গ. নিষ্কাম কর্ম — ঘ. সকাম কর্ম

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. জন্মান্তর কাকে বলে?
২. নিষ্কাম কর্ম কাকে বলে?
৩. মোক্ষ বলতে কী বোঝেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. জন্মান্তরবাদ কাকে বলে? সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
২. দেহ ও আত্মার মধ্যকার সম্পর্ক বর্ণনা করুন।
৩. জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদের সম্পর্ক আলোচনা করুন।

পাঠ-৪ : পাপ-পুণ্য ও স্বর্গ-নরক

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- পাপ ও পুণ্যের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- স্বর্গের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কারা স্বর্গে যাবে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- নরকের ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন।
- কারা নরকে যাবে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

পাপ

আমরা যে সকল কর্ম করি, সেগুলো থেকে পরিণামে দুরকমের ফল পাওয়া যায়: ক. পাপ ও খ. পুণ্য।

যে কর্ম করলে নিজের আত্মা পরিণামে কষ্ট পায় বা অন্যের কষ্ট বা ক্ষতির কারণ হয় তার নাম পাপ। যেমন– মাদকাসক্তির দ্বারা মাদকাসক্তের দেহের ও মনের ক্ষতি হয়, তাই মাদকাসক্তি পাপকর্ম। স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্যকে শারীরিক, মানসিক নির্যাতন করা, প্রহার করে আহত করা বা হত্যা করাও পাপ কর্ম। সুতরাং যে কর্ম করলে ধর্মহানি ঘটে তা পাপ কর্ম।

পুণ্য

যে কাজ করলে ধর্ম রক্ষা হয়, আত্মার প্রশান্তি ও জীব-জগতের হিত সাধিত হয় তা পুণ্য কর্ম। যেমন– একজন আর্ত বা পীড়িতের সেবা করলে পুণ্য লাভ হয়।

নিজের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য নামক প্রবৃত্তি গুলোকে দমন করে সৎ পথে চললে নিজের মঙ্গল হয়। সুতরাং এ কর্ম পুণ্য কর্ম।

আবার উপাসনা ও পূজায় ঈশ্বর ও দেবগণ প্রীত হন। সুতরাং তাঁদের উপাসনা ও পূজা পুণ্যকর্ম।

পাপ ও পুণ্যের ফল এবং স্বর্গ ও নরক

পাপ কর্ম করলে দন্ড বা শাস্ড়ি পেতে হয়। ইহকালে কারা ভোগসহ নানা রকম শাস্তি পেতে হয়। পাপ করলে পাপীর অনুশোচনা হয়। অনুশোচনার অনলে দগ্ধ হওয়াও এক ধরনের শাস্ড়ি।

আবার পরকালেও দন্ড পেতে হয়। মৃত্যুর পর যমরাজ পাপ-পুণ্যের বিচার করে শাস্তি দেন বা পুরস্কৃত করেন।

পরকালে যেখানে থেকে শাস্তি ভোগ করতে হয় তার নাম নরক।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে ছিয়াশিটি নরকের বর্ণনা রয়েছে। এখানে কয়েকটি পাপকর্ম এবং তার জন্য যে নরকযন্ত্রণা ভোগ করার কথা বলা হয়েছে তার বর্ণনা দিচ্ছি :

যারা পরের ধনসম্পদ, নারী বা শিশু অপহরণ করে, যমের অনুচরেরা তাদের শক্ত করে বেঁধে তামিস্র নরকে ফেলে দেয়। তামিস্র নরক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। পাপী সেখানে খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে কষ্ট পায়। যমের অনুচরদের হাতেও নিপীড়িত হয়।

যারা জীবিত অবস্থায় যে-যে প্রকারে অন্যদের প্রতি অত্যাচার করেছিল, হিংসা-বিদ্বেষের প্রকাশ ঘটিয়েছিল, নরকে পাপীদের ঠিক সেই সেই প্রকারে শাস্ড়ি দেওয়া হয়।

তবে পাপের তারতম্য অনুসারে নরকযন্ত্রণা ভোগের ক্ষেত্রেও তারতম্য ঘটে।

পাপ ভোগ শেষ হলে পাপী নরকযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায় এবং কর্মফল অনুসারে আবার তার পুনর্জন্ম হয়ে থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে যমরাজ তার অনুচরদের সাহায্যে মৃত ব্যক্তিদের যেখানে এনে দোষ-গুণ বিচার করেন সে স্থানটিকে নরক নামে অভিহিত করা হয়।

নরক সমূহের মধ্যে তামিস্র নরকের কথা বলেছি। আরও রয়েছে অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, কুম্ভীপাক, অসিপত্রবন ইত্যাদি।

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবের দেহ বিনষ্ট হয়। তখন কর্মফল ভোগের জন্য তার সূক্ষ্ম দেহের উদ্ভব ঘটে। ঐ সূক্ষ্ম দেহ নিয়ে জীব নরকযন্ত্রণা ভোগ করে।

স্বর্গ

পাপের ফলে জীবের সূক্ষ্ম দেহ যেমন নরকযন্ত্রণা ভোগ করে, তেমনি আবার পুণ্য কর্মের জন্য সুখ ভোগ করে। যে সুখময় স্থান পুণ্যবান লাভ করে তার নাম স্বর্গ। সুখ ভোগের জন্য স্বর্গলোক রয়েছে। স্বর্গে রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি ইত্যাদি নেই। সেখানে আছে কেবল সুখ আর আনন্দ।

ধর্মগ্রন্থে স্বর্গের যে বর্ণনা রয়েছে, তাতে দেখা যায়, স্বর্গ দেব-দেবীর বাসস্থান। দেব-দেবীদের রাজা হলেন ইন্দ্র। তিনি তাঁর বৈজয়ন্ড় নামক প্রাসাদে বাস করেন। ইন্দ্রের দেবসভার নাম সুধর্ম। স্বর্গের রাজধানীর নাম অমরাবতী। স্বর্গে নন্দনকানন নামে চির-অমলিন একটি বাগান আছে। স্বর্গে প্রবাহিত নদীটির নাম মন্দাকিনী। স্বর্গের খাদ্য ও পানীয় অতীব সুস্বাদু।

কারা স্বর্গে যেতে পারবেন?

যাঁরা হিংসাদ্বেষ ত্যাগ করেছেন, যাঁরা ধৃতি ক্ষমা দম প্রভৃতি ধর্মের লক্ষণ অনুসারে জীবন যাপন করেন, যাঁরা জীব-জগতের সেবা করেন, তাঁরা পুণ্যবান। আর পুণ্যবান ব্যক্তিরাই স্বর্গলাভ করেন।

তবে অর্জিত পুণ্যেরও একটা শেষ আছে। পুণ্যক্ষয় হলে স্বর্গভোগের অবসান ঘটে। তখন জীবকে মরদেহ ধারণ করে আবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে হয়।

একমাত্র নিষ্কাম কর্মের দ্বারা মোক্ষলাভ করলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

পাঠ সংক্ষেপ

যে কর্ম করলে নিজের আত্মা পরিণামে কষ্ট পায় বা অন্যের কষ্ট ও ক্ষতির কারণ হয়, তাকে পাপ বলা হয়। আর যে কর্ম করলে আত্মার প্রশান্ড়ি ঘটে এবং জীব-জগতের মঙ্গল হয় তাকে বলা হয় পুণ্য।

পাপ করলে নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। নরকযন্ত্রণা ভোগ শেষে আবার জন্ম নিতে হয়। তামিস্র, অন্ধতামিস্র প্রভৃতি ছিয়াশিটি নরক রয়েছে।

অন্যদিকে পুণ্যকর্ম করলে পুণ্যবান স্বর্গভোগ করেন। স্বর্গ সুখের স্থান। স্বর্গভোগ শেষ হলে আবার পৃথিবীতে জন্ম নিতে হয়। তবে নিষ্কাম কর্ম করলে মোক্ষ লাভ হয়। তখন আর পুনর্জন্ম হয় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৬.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১. অন্যের ক্ষতিকর কর্মকে ধর্মগ্রন্থ অনুসারে কী বলা হয়?
   ক. অন্যায় খ. অবিচার
   গ. গর্হিত কর্ম ঘ. পাপ

২. কোনটি পুণ্য কর্ম?
   ক. আহার করা খ. বেড়ানো
   গ. পূজা করা ঘ. চাকরি করা

৩. 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসারে নরক কয়টি?
   ক. ছাপ্পান্নটি খ. ছেষট্টিটি
   গ. ছিয়াত্তুরটি ঘ. ছিয়াশিটি

৪. নিচের কোনটি স্বর্গে অবস্থিত?
   ক. তামিস্র খ. রৌরব
   গ. নন্দনকানন ঘ. মহারৌরব

৫. স্বর্গে প্রবাহিত নদীটির নাম কী?
   ক. সুহাসিনী খ. মন্দাকিনী
   গ. স্রোতস্বিনী ঘ. প্রবাহিনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পাপ কাকে বলে?
২. পুণ্য কাকে বলে?
৩. স্বর্গ কাকে বলে?
৪. নরক কাকে বলে?
৫. চারটি নরকের নাম লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. উদাহরণসহ পাপ ও পুণ্যের ধারণা ব্যাখ্যা করুন।
২. কারা স্বর্গে যেতে পারবেন? স্বর্গের বর্ণনা দিন।
৩. স্বর্গ ও নরকের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করুন।
৪. পাঁচটি পাপকর্ম ও পাঁচটি পুণ্যকর্মের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন এবং প্রতিটি পাপকর্ম কেন পাপকর্ম এবং প্রতিটি পুণ্যকর্ম কেন পুণ্যকর্ম তা ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ-৫ : দেব-দেবী ও পূজা-পার্বণ

উদ্দেশ্য।

এ পাঠ শেষে আপনি

- দেবতা বা দেব-দেবী বলতে কাদের বোঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- দেব-দেবী প্রধানত কত প্রকার, তা বলতে পারবেন।
- বৈদিক, পৌরাণিক ও লৌকিক দেব-দেবীর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বৈদিক দেবতা রূপে অগ্নি ও ঊষার পরিচয় দিতে পারবেন।
- পৌরাণিক দেবতা রূপে বিষ্ণু ও সরস্বতীর বর্ণনা দিতে পারবেন।
- পূজা-পার্বণ – এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পূজায় সাধারণ নিয়ম বর্ণনা করতে পারবেন।
- সরস্বতী পূজা পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

দেবতা বা দেব-দেবী

আমরা জানি ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো আকার নেই। তিনি নিরাকার। তবে তাঁর ক্ষমতা সীমাহীন। তিনি সর্বশক্তিমান। তাই তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যে-কোনো রূপ ধারণ করতে পারেন। তাঁর কোনো গুণ বা শক্তিকেও তিনি আকার দিতে পারেন। ঈশ্বরের কোনো গুণ বা শক্তি যখন আকার পায়, তখন তাকে দেবতা বা দেব-দেবী বলে।

ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট জীবের কল্যাণে বা তাঁর কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজের কোনো গুণ বা শক্তিকে বিশেষ আকার বা রূপে প্রকাশ করেন। যেমন– ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেব-দেবী।

ঈশ্বর যে-রূপে সৃষ্টি করেন, তাঁর নাম ব্রহ্মা। তিনি যে-রূপে সৃষ্টিকে পালন করেন তাঁর নাম বিষ্ণু। তাঁর শক্তির রূপ হচ্ছেন দেবী দুর্গা। ঈশ্বর যে-রূপে বিদ্যা দান করেন, তাঁর নাম দেবী সরস্বতী ইত্যাদি।

দেব-দেবীর প্রীতির জন্য ভক্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। দেব-দেবীদের সন্তুষ্ট করে বিশেষ বিশেষ গুণ বা শক্তি প্রার্থনাও করা হয়। যেমন বিদ্যার জন্য দেবী সরস্বতীর কাছে প্রার্থনা জানানো হয়।

দেবী-দেবীদের সন্তুষ্ট করার জন্য যে প্রক্রিয়া ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত আছে, তার নাম যজ্ঞ ও পূজা। যজ্ঞ বা পূজা করলে দেব-দেবীরা সন্তুষ্ট হন। ভক্ত তাঁদের কৃপা লাভ করে। সুখ ও শান্তি পান। আর দেব-দেবীর পূজা করলে ঈশ্বরও সন্তুষ্ট হন।

দেব-দেবীর প্রকারভেদ

ধর্মগ্রন্থ বেদ ও পুরাণে দেব-দেবীর উল্লেখ আছে, বর্ণনা আছে। আবার কিছু দেব-দেবী আছেন বেদ ও পুরাণে তাঁদের উল্লেখ নেই। এভাবে প্রধানত তিন প্রকার দেব-দেবীর পরিচয় পাওয়া যায়।

ক. বৈদিক দেব-দেবী
খ. পৌরাণিক দেব-দেবী
গ. লৌকিক দেব-দেবী

ক. বৈদিক দেব-দেবী

বেদে যে সকল দেব-দেবীর বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁরা হলেন বৈদিক দেব-দেবী। যেমন– অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, ঊষা, যম প্রভৃতি। বৈদিক যুগে দেব-দেবীদের প্রতিমা বা বিগ্রহ ছিল না। বৈদিক যুগে ঋষিরা দেব-দেবীর রূপ, গুণ ও প্রভা ভাবাবেগে দর্শন করেছেন এবং মাধ্যম রূপে মন্ত্রের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ করেছেন।

খ. পৌরাণিক দেব-দেবী

পুরাণসমূহ ধর্মগ্রন্থ। পুরাণসমূহে যে সকল দেব-দেবীর বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁরা পৌরাণিক দেব-দেবী। কয়েকজন বৈদিক দেব-দেবীসহ আরও কিছু দেব-দেবীর বর্ণনা পুরাণসমূহে পাওয়া যায়। সেই বর্ণনা অনুসারে সে-সকল দেব-দেবীর প্রতিমা বা বিগ্রহ নির্মাণ করে তাঁদের পূজা করার বিধি-বিধানও রচিত হয়েছে। যেমন– ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ প্রভৃতি।

গ. লৌকিক দেব-দেবী

এমন কিছু দেব-দেবী রয়েছেন, যাঁদের বর্ণনা বেদ ও পুরাণে নেই। এঁদেরকে বলা হয় লৌকিক দেব-দেবী। যেমন– মনসা, শীতলা, দক্ষিণ বায়, সুমতি, সুবচনী, নাটাইচন্ডী, পাটাইচন্ডী প্রভৃতি। অবশ্য এঁদের মধ্যে কিছু দেব-দেবী পুরাণেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

বৈদিক দেব-দেবী : অগ্নি ও ঊষা

আমরা এখানে বৈদিক অগ্নি দেব এবং ঊষা দেবীর পরিচয় বৈদিক দেব-দেবীর দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করছি।

বৈদিক দেব-দেবীদের মধ্যে অগ্নি অন্যতম। অগ্নি দেব একজন প্রধান দেবতা রূপে প্রকাশিত। তিনি পৃথিবীতে সবসময় থাকেন।

অগ্নি দেবের গুরুত্বের কারণ বর্ণনা করার আগে বৈদিক যুগের উপাসনা-পদ্ধতি সম্পর্কে জেনে নিলে আমাদের উপলব্ধির ক্ষেত্রে তা সহায়ক হবে। অগ্নি প্রজ্বলিত করে অগ্নির রূপ ও মাহাত্ম্য প্রকাশ মন্ত্র উচ্চারণ করা হতো। তার সঙ্গে পিঠা, পায়স, মাংস, দুধ প্রভৃতি দ্রব্য সেই অগ্নিতে উৎসর্গ করা হতো। মাঝে মাঝে ঘি নিক্ষেপ করা হতো – অগ্নিকে প্রজ্বলিত রাখার জন্যে। এ পদ্ধতিটির নাম যাগ। 'যাগ' অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যজ্ঞ করা হতো। 'যজ্ঞ' শব্দটির মানে হচ্ছে প্রার্থনা। ঈপ্সিত বৈদিক দেবতাকে মন্ত্রের মধ্য দিয়ে আহ্বান করা হতো। বৈদিক যুগের ঋষিরা মনে করতেন, ঈপ্সিত দেবতা উপস্থিত হয়েছেন, তারপর তাঁর কাছে সুনির্দিষ্ট প্রার্থনা জানাতেন। মন্ত্রগুলির তাই দুটি অংশ থাকত: স্তুতি ও প্রার্থনা। অগ্নি পৃথিবীর দেবতা। তাই তাঁকে যেমন পূজা করা হতো, তেমনি তাঁর মাধ্যমে অন্য দেব-দেবীর কাছে স্তুতি ও প্রার্থনা পৌঁছে দেয়ার প্রয়াস গ্রহণ করা হতো।

পুরোহিত যজ্ঞের কাজে প্রধান ভূমিকা পালন করতেন। যজমানেরা (যজ্ঞ কারীরা) পুরোহিতের মাধ্যমে যজ্ঞ সম্পাদন করতেন।

যেহেতু অগ্নিদেবও মাধ্যম হিসেবে অন্য দেবতাদের কাছে যজমানের স্তুতি ও প্রার্থনা পৌঁছে দিতেন, তাই অগ্নির ভূমিকাও অনেকটা পুরোহিতের মতোই। তাই অগ্নি দেবকে পুরোহিত বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, অন্যান্য বৈদিক দেব-দেবীরা অগ্নিমুখে ভোজন করেন।

এখানে ঋগ্‌বেদ থেকে অগ্নিদেবের স্তুতিমূলক একটি মন্ত্র উপস্থাপন করছি। মন্ত্রগুলো ছন্দোবদ্ধ কবিতা – তিন বা চার পঙ্‌ক্তির।

অগ্নিমীলে পুরোহিতং
যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্ ॥
(১/১/১)

– অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত, দীপ্তিমান, যজ্ঞে দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিকস্বরূপ, শ্রেষ্ঠরত্নধারী।

ঊষা দেবী

বেদে দেবগণের চেয়ে দেবীদের সংখ্যা অনেক কম। এ অল্প সংখ্যক দেবীর মধ্যে ঊষা অতুলনীয়া।

ঊষা দেবী রাত্রির অন্ধকার দূর করেন। তিনি সন্ধান দেন আলোকোজ্জ্বল জগতের। তাঁর আগমনে প্রকৃতিতে জাগে কর্মচাঞ্চল্য।

ঊষাকালের অধিষ্ঠাত্রী দীপ্তিময়ী ঊষা দেবীর কাছে ঋষি কবির প্রার্থনা :

'হে দেবদুহিতা ঊষা, তুমি প্রভাত কর,
আমাদের ধন দান কর।
হে বিভাবরী, তুমি প্রভাত কর,
আমাদের অন্নদান কর।
হে দেবী, তুমি প্রভাত কর,
দানশীলা হয়ে আমাদের ধনদান কর।'

পৌরাণিক দেব-দেবী : বিষ্ণু, দুর্গা ও সরস্বতী

পৌরাণিক দেব-দেবীও অনেক। আমরা এখানে দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিষ্ণুদেব ও সরস্বতীদেবীর পরিচয় তুলে ধরছি।

বিষ্ণু

ব্রহ্ম বা ঈশ্বর যে রূপে জীব ও জগৎকে পালন করেন তাঁর নাম বিষ্ণু। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব পৌরাণিক দেব-দেবীর মধ্যে প্রধান।

পুরাণে বিষ্ণুর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, চাঁদের আলোর মতো তাঁর গায়ের রং। তাঁর চার হাত, চার হাতে থাকে চারটি দ্রব্য। ওপরের দিকের বাঁ হাতে থাকে শঙ্খ, ডান হাতে থাকে চক্র। বিষ্ণুর এ চক্রের নাম সুদর্শন। বিষ্ণুর নিচের দিককার বাঁ হাতে থাকে গদা; আর ডান হাতে থাকে পদ্ম।

বিষ্ণুর বাহন গরুড় পাখি।

বিষ্ণু পূজার নির্দিষ্ট কোনো তারিখ নেই। যে-কোনো দিন বিষ্ণু পূজা করা যায়। উল্লেখ্য, অন্য সকল দেব-দেবীর পূজা করার সময় বিষ্ণুর পূজা অবশ্য করণীয়।

তুলসী পাতা বিষ্ণুর খুব প্রিয়। তাই তুলসী পাতা ছাড়া বিষ্ণুর পূজা করা হয় না।

বিষ্ণুর আরেক নাম নারায়ণ। তিনি দুষ্টের দমন করেন। সজ্জনদের পালন করেন। অন্যায়-অবিচার দূর করে ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

বিষ্ণুর প্রণাম মন্ত্র

ওঁ নমো ব্রাহ্মণ্যদেবায়গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

সরলার্থ

ব্রাহ্মণ্যদেব বিষ্ণুকে নমস্কার। পৃথিবী, ব্রাহ্মণ ও জগতের মঙ্গলকারী কৃষ্ণকে, গোবিন্দকে বারবার নমস্কার করি।

সরস্বতী দেবী

ব্রহ্ম বা ঈশ্বর যে রূপে নিজের জ্ঞানকে প্রকাশ করেন তাঁর নাম সরস্বতী দেবী।
সরস্বতী দেবী শিক্ষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, নাট্যকলা, নৃত্যকলা, চিত্রকলা, ভাস্কর্যসহ সকল প্রকার সৃষ্টিশীল বা সুকুমার শিল্প এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের দেবী। তিনি আমাদের সকল প্রকার জ্ঞান দান করেন।
সরস্বতী পূজার মধ্য দিয়ে জ্ঞানের প্রতি, সৃষ্টিশীলতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।
সরস্বতী দেবীর গাত্রবর্ণ শুভ্র। চন্দ্রের মতো তাঁর শোভা। তার হাতে থাকে পুস্তক ও বীণা। বীণা হাতে থাকে বলে সরস্বতী দেবীর আরেক নাম বীণাপাণি।
শ্বেত হংস সরস্বতী দেবীর বাহন।

পূজা-পার্বণ

দেব-দেবীদের পূজা করে তাঁদের সন্তুষ্ট করা হয়। এটা করা হয় ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য। আর বিশেষ বিশেষ দেব-দেবীর কাছ থেকে বিশেষ বিশেষ গুণ বা ক্ষমতার প্রার্থনা জানানোর জন্য তাঁদের পূজা করা হয়।
পূজা শব্দটির মানে পুষ্প কর্ম। পুষ্প, পত্র, ধূপ, দীপ, ফল ও অন্যান্য দ্রব্যের নৈবেদ্য প্রভৃতি দিয়ে দেব-দেবীর আরাধনাকে ও শ্রদ্ধা জানানোকে পূজা বলা হয়। পূজা সাকার উপাসনার একটি বিশেষ পদ্ধতি। পূজা করার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া রয়েছে।
'পার্বণ' শব্দের অর্থ হলো উৎসব। 'উৎসব' বলতে বোঝায় আনন্দময় অনুষ্ঠান। পূজা নিত্যকার করণীয়। বিশেষ বিশেষ তিথিতেও পূজা করা হয়। আর আড়ম্বরের সঙ্গে আয়োজিত ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানকে বলা হয় পার্বণ। পূজার মধ্য দিয়ে ভক্ত ও দেবতা উভয়েই আনন্দ লাভ করেন। পূজা একক ও পারিবারিক ভাবে করা হয়। আবার সকলে মিলে সামাজিকভাবেও করা হয়। সকলে মিলে সার্বজনীন যে পূজা করা হয় তা হয়ে ওঠে পার্বণ বা উৎসবমুখর।
পূজায় দেব-দেবীর প্রতিমা কেবল সামনেই থাকে না। পূজারীরা তাঁদের অন্তরেও ধারণ করে।
পূজার মধ্য দিয়ে একদিকে পূজারীর দেব-দেবীর প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি প্রকাশ পায়, অন্যদিকে তা হয়ে ওঠে সামাজিক সংহতির সূত্র এবং আনন্দময় উৎসব, সাংস্কৃতিক-নান্দনিক ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখার প্রক্রিয়া।
আমরা এখন দৃষ্টান্ত হিসেবে সরস্বতী দেবীর পূজার বর্ণনা দিচ্ছি।

দেবী সরস্বতী পূজা

মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী দেবীর পূজা করা হয়। সরস্বতী দেবীর পূজার ক্ষেত্রেও সাধারণ পূজা বিধি অনুসরণ করা হয়। পূজার এক পর্যায়ে সরস্বতী দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়।
পুষ্পাঞ্জলির সুনির্দিষ্ট মন্ত্র রয়েছে।

পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র

ওঁ সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ।
বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত-বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ ॥
এষ সচন্দন পুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলিঃ
ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ ॥

সরলার্থ

সরস্বতী, ভদ্রকালী এবং বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত ও বিদ্যাস্থানকে সর্বদা প্রণাম করি।
এ সচন্দন ও বিল্বপত্রের অঞ্জলি দিয়ে দেবী সরস্বতীকে শ্রদ্ধা জানাই।

সরস্বতী দেবীর প্রণামমন্ত্র

ওঁ সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোহস্তুতে ॥

সরলার্থ

হে মহাভাগ সরস্বতী, হে বিদ্যাদেবী, পদ্মফুলের মতো চক্ষুবিশিষ্টা, হে বিশ্বরূপা, বিশাল চক্ষুর অধিকারিণী, আমাকে বিদ্যা দাও। তোমাকে প্রণাম জানাই।

পাঠ সংক্ষেপ

ঈশ্বরের কোনো গুণ বা শক্তিকে দেবতা বা দেব-দেবী বলা হয়। যেমন– বিষ্ণু ঈশ্বরের পালন শক্তি। ঈশ্বর যে-রূপে বিদ্যা দেন, তার নাম সরস্বতী। দেব-দেবী তিন প্রকার – বৈদিক, পৌরাণিক ও লৌকিক। বৈদিক দেবতা অগ্নি দেবতাদের পুরোহিত। অন্যান্য বৈদিক দেব-দেবী অগ্নিমুখে ভোজন করেন। ঊষাকালে অধিষ্ঠিত দেবী ঊষা। পূজা সাকার উপাসনার বিশেষ পদ্ধতি। দেব-দেবীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাবশত তাঁদের পূজা করা হয়। অন্য দিকে বিশেষ বিশেষ দেব-দেবীর কাছে বিশেষ বিশেষ গুণ বা শক্তি প্রার্থনা করেও পূজা করা হয়। যেমন– বিদ্যা লাভের জন্য বিদ্যার দেবী সরস্বতীর পূজা করা হয়। উৎসবে রূপায়িত হলে পূজা হয়ে ওঠে পার্বণ। পূজার নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে। নির্দিষ্ট প্রণাম মন্ত্রে দেব-দেবীদের প্রণাম জানানো হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১৬. ৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১. ঈশ্বর যে-রূপে সৃষ্টি করেন তাঁর নাম কী?
   ক. বিষ্ণু খ. ব্রহ্মা
   গ. শিব ঘ. দুর্গা

২. সরস্বতী দেবী কী দান করেন?
   ক. ধন খ. শক্তি
   গ. বিদ্যা ঘ. সম্ভ্রম

৩. দেব-দেবী প্রধানত কত প্রকার?
   ক. দুই খ. তিন
   গ. চার ঘ. পাঁচ

৪. নিম্নলিখিত কোন দেবী লৌকিক হয়েও পৌরাণিক দেবীর মর্যাদা পেয়েছেন?
   ক. বিষ্ণু খ. ইন্দ্র
   গ. ব্রহ্মা ঘ. মনসা

৫. কোন দেবতাকে পুরোহিত বলা হয়েছে?
   ক. সূর্য খ. অগ্নি
   গ. বিষ্ণু ঘ. যম

৬. বিষ্ণুর চক্রের নাম কী?
   ক. পাঞ্চজন্য খ. গান্ডীব
   গ. সুদর্শন ঘ. সারথি

৭. বিষ্ণুর বাহনের নাম কী?
   ক. শ্বেত হংস খ. হাতি
   গ. সিংহ ঘ. গরুড় পাখি

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. দেবতা বা দেব-দেবী বলতে কী বোঝেন?
২. 'বৈদিক' দেব-দেবী কত প্রকার? পৌরাণিক দেব-দেবীর পরিচয় দিন।
৩. বিষ্ণুর রূপ বর্ণনা করুন।
৪. পূজা বলতে কী বোঝায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বৈদিক দেবতা রূপে অগ্নির বর্ণনা দিন।
২. বিষ্ণু দেবের পরিচয় দিন।
৩. সরস্বতী দেবীর পরিচয় দিন।
৪. সরস্বতী দেবীর পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্রটি লিখুন এবং তার সরলার্থ বলুন।
৫. দেব-দেবীদের পূজা করা হয় কেন? বুঝিয়ে লিখুন।

পাঠ-৬ : নিত্যকর্ম ও নৈমিত্তিক কর্ম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- নিত্যকর্মের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নিত্যকর্মের প্রকারভেদ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- নৈমিত্তিক কর্মের ধারণা ব্যাখ্যা করতে ও দৃষ্টান্ত দিতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

নিত্যকর্ম

নিত্যকর্ম বলতে প্রতিদিনের কর্ম বোঝায়। প্রতিদিন নিদ্রাভঙ্গের পর থেকে রাতে শয্যা গ্রহণ পর্যন্ত যে-সকল কর্ম ধর্মাচার অনুসারে করণীয়, সেগুলোই নিত্যকর্ম। আর বিশেষ প্রয়োজনে বা বিশেষ উদ্দেশ্যে যে-কর্ম করা হয় তার নাম নৈমিত্তিক কর্ম। নিত্যকর্ম পালন নিয়মিত ও শৃঙ্খলামন্ডিত জীবন যাপনের সহায়ক।

নিত্য-কর্মের প্রকারভেদ

নিত্যকর্ম সাধারণত ছয় ভাগে বিভক্ত :

১. প্রাতঃকৃত্য
২. পূর্বাহ্নকৃত্য
৩. মধ্যাহ্নকৃত্য
৪. অপরাহ্নকৃত্য
৫. সায়াহ্নকৃত্য
৬. রাত্রিকৃত্য

এ কথা সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে সময়কাল অনুসারে নিত্যকর্মসমূহের নামকরণ করা হয়েছে। যেমন– প্রাতঃকালে যে-সকল কাজ করা হয় সেগুলো প্রাতঃকৃত্য, মধ্যাহ্নের নিত্যকর্মই মধ্যাহ্নকৃত্য ইত্যাদি।

সূর্যোদয়ের ৩০/৪০ মিনিট পূর্বের সময়কে বলা হয় ব্রাহ্মমুহূর্ত। ব্রাহ্মমুহূর্তে ঘুম থেকে উঠে পূর্ব বা উত্তর মুখ হয়ে বসে বলতে হয়:

ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্ড়কারী
ভানুঃ শশী ভূমিসূতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনিরাহু কেতু
কুর্বন্তু সর্বে মম সুপ্রভাতম্ ॥

সরলার্থ

ব্রহ্মা, মুরারি (বিষ্ণু), ত্রিপুর–বিনাশী (শিব), সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি – এ গ্রহগণ, রাহু ও কেতু সকলে আমার প্রভাতটি সুন্দর করুন।

তারপর শয্যা ত্যাগ করে বাইরে এসে সূর্যকে এ মন্ত্রে প্রণাম করতে হয় :

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ॥

সরলার্থ

জবা ফুলের মতো লাল, মহাজ্যোতির্ময় অন্ধকার দূরকারী, সমস্ত পাপ বিনাশকারী কশ্যপ ঋষির পুত্র সূর্যদেবকে প্রণাম জানাই।

তারপর তুলসীতলায় প্রণাম করতে হয় এবং মা-বাবাকে প্রণাম করে দিনের কাজ শুরু করতে হয়।

পূর্বাহ্নকৃত্য হিসেবে স্নান সেরে প্রাতঃসন্ধ্যা (প্রাতঃ কালের উপাসনা) ও দেবপূজাদি যথা নিয়মে সম্পন্ন করতে হয়।

মধ্যাহ্নে মধ্যাহ্নসন্ধ্যা (মধ্যাহ্নকালীন উপাসনা), অতিথি আপ্যায়ন এবং অপরাহ্নে প্রয়োজন মতো পার্বণশ্রাদ্ধাদি করণীয়।

সায়াহ্নে যথা নিয়মে সন্ধ্যা-পূজা বন্দনাদি করতে হয়। করতে হয় উপাসনা।

রাত্রিকৃত্যে আহারাদি সেরে 'পদ্মনাভ' (বিষ্ণু) স্মরণ বা উচ্চারণ করে শয্যা গ্রহণের মধ্য দিয়ে নিত্যকর্মের সমাপ্তি ঘটে।

নিত্যকর্মে যে কর্মগুলোর কথা বলা হলো তার বাইরে জীবিকা অর্জনের অন্যান্য কাজকর্ম করণীয়। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগ্রহণ করতে হয়।

নিত্যকর্ম হিসেবে এখানে সাধারণভাবে করণীয় কর্মের কথা বলা হলো। সনাতন ধর্মে বিভিন্ন মত রয়েছে – উপাস্য দেবতার ভিত্তিতে এসব মত। যেমন– শক্তির দেবীর উপাসকেরা শাক্ত। শিবের উপাসকেরা শৈব, গণেশের উপাসকেরা গাণপত্য, সূর্যের উপাসকেরা সৌর এবং বিষ্ণুর উপাসকেরা বৈষ্ণব। এ-সব উপ-সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজ নিজ মত অনুসারেও নিত্যকর্ম করে থাকেন।

নৈমিত্তিক কর্ম

নিমিত্ত মানে প্রয়োজন। বিশেষ প্রয়োজনে বছরের বিভিন্ন সময়ে যে-সকল ধর্মকৃত্য করা হয়, সনাতন ধর্ম অনুসারে সে-সকল ধর্মকৃত্যকে বলা হয় নৈমিত্তিক কর্ম। যেমন– একাদশী উপবাস, দশবিধ সংস্কার, মরণোত্তর কৃত্য ইত্যাদি।
এছাড়া বছরের বিভিন্ন সময়ে করণীয় ধর্মকৃত্য রয়েছে। যেমন– বৈশাখের শুরুতে বর্ষবরণ, নির্ধারিত দিনে দেব-দেবীর পূজা ও অন্যান্য ধর্মানুষ্ঠান।

রথযাত্রা, মনসা পূজা, জন্মাষ্টমী, মহালয়া, দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, শ্যামা পূজা (দীপান্বিতা) ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, কার্ত্তিক পূজা, বিশ্বকর্মা পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, সরস্বর্তী পূজা, দোলযাত্রা, চৈত্রসংক্রান্তি, গাজন বা শিবপূজা এবং শিবরাত্রি ব্রত ইত্যাদি সনাতন ধর্মানুসারে নৈমিত্তিক কর্ম।
এ সকল নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মের মধ্য দিয়েই সনাতন ধর্ম ও সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করা যায়।

পাঠ সংক্ষেপ

প্রতিদিন নিদ্রা ভঙ্গের পরেরকার করণীয় কর্মকে নিত্যকর্ম বলা হয়। নিত্যকর্ম ছয় ভাগে বিভক্ত: প্রাতঃকৃত্য, পূর্বাহ্নকৃত্য, মধ্যাহ্নকৃত, অপরাহ্নকৃত্য, সায়াহ্নকৃত্য ও রাত্রিকৃত্য। এ সকল ধর্মাচার ছাড়াও জীবিকা অর্জনের জন্য নিয়মিত কর্ম করতে হয়।

নৈমিত্তিক কর্ম বলতে বোঝায় নিমিত্ত বা প্রয়োজনে করণীয় কর্মসমূহ। একাদশীর উপবাস, রথযাত্রা, মহালয়া, জন্মাষ্টমী, দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতী পূজা, দোলযাত্রা, শিবরাত্রির ব্রত প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্মের দৃষ্টান্ত। এ সকল নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মের মধ্য দিয়ে সনাতন ধর্ম ও সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শনাক্ত করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৬.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১. প্রতিদিনের করণীয় কর্মকে কী বলা হয়?
   ক. নৈমিত্তিক কর্ম　　খ. নিত্য কর্ম
   গ. কাম্য কর্ম　　ঘ. আবশ্যিক কর্ম

২. কোনটি প্রাতঃকৃত্য?
   ক. সূর্য প্রণাম　　খ. স্নান
   গ. একাদশী　　ঘ. আহার

৩. সূর্যোদয়ের ৩০/৪০ মিনিট পূর্বের সময়কে কী বলে?
   ক. ব্রাহ্মমুহূর্ত　　খ. প্রভাতী
   গ. শুভ মুহূর্ত　　ঘ. শুভক্ষণ

৪. মুরারি বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?
ক. ব্রহ্মা খ. বিষ্ণু
গ. শিব ঘ. সূর্য

৫. কখন 'পদ্মনাভ'- এর নাম স্মরণ বা উচ্চারণ করতে হয়?
ক. প্রাতঃ কালে খ. মধ্যাহ্নে
গ. সায়াহ্নে ঘ. রাত্রিকালে শোবার সময়

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. নিত্যকর্ম কাকে বলে?
২. নৈমিত্তিক কর্ম কাকে বলে?
৩. পাঁচটি নৈমিত্তিক কর্মের নাম লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. নিত্যকর্ম ও নৈমিত্তিক কর্মের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করুন।
২. নিত্যকর্ম হিসেবে প্রাতঃকৃত্যের বর্ণনা দিন।

পাঠ-৭: ব্রত, সংস্কার ও মরণোত্তর কৃত্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- 'ব্রত'- এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সংস্কারের ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন।
- দশবিধ সংস্কারের নাম বলতে পারবেন।
- 'বিবাহ' নামক সংস্কারটি বর্ণনা করতে পারবেন।
- সনাতন ধর্মানুসারে মরণোত্তর কৃত্যের বর্ণনা দিতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

ব্রত

কোনো বিশেষ মনস্কামনা পূরণের জন্য যে পূজা বা ধর্মানুষ্ঠান করা হয় তার নাম ব্রত। যেমন– শিবরাত্রির ব্রত, অক্ষয় তৃতীয়া ব্রত, দুর্গাষ্টমী ব্রত, মঙ্গলচন্ডী ব্রত ইত্যাদি।

সংস্কার

'সংস্কার' কথাটির অনেক প্রকার অর্থ আছে। এখানে যুগাগত প্রথা হিসেবে ধর্মাচার হিসেবে পালনীয় কিছু কৃত্যকে সংস্কার বলা হয়েছে। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সমগ্র জীবনে যে-সকল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করার শাস্ত্রীয় বিধান আছে সেগুলোকে সংস্কার বলা হয়।

স্মৃতিশাস্ত্রে দশ প্রকার সংস্কারের উলে- খ আছে। সেগুলো হলো:

১. গর্ভাধান	২. পুংসবন,	৩. সীমন্তোন্নয়ন,	৪. জাতকর্ম
৫. নামকরণ,	৬. অন্নপ্রাশন	৭. চূড়াকরণ	৮. উপনয়ন
৯. সমাবর্তন,	১০. বিবাহ		

সবগুলো সংস্কার ভিত্তিক অনুষ্ঠান এখন আর সচরাচর করা হয় না। নিচে প্রধান প্রধান ও প্রচলিত সংস্কার গুলোর পরিচয় দিচ্ছি :

জাতকর্ম

জাতকর্ম সংস্কারে সন্তানের জন্মের পর পিতা যব, যষ্টি মধু ও ঘৃত দ্বারা সন্তানের জিহ্বা স্পর্শ করে মন্ত্রোচ্চারণ করেন।

নামকরণ

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর দশম, একাদশ, দ্বাদশ বা শততম দিবসে তার নামকরণ করতে হয়।

অন্নপ্রাশন

পুত্রের জন্মের ষষ্ঠ মাসে এবং কন্যার জন্মের পঞ্চম, অষ্টম বা দশম মাসে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করে প্রথম অন্নভোজন করানোর নাম অন্নপ্রাশন।

বিবাহ

যৌবনে দেব ও পিতৃপূজা, হোম প্রভৃতির মাধ্যমে মন্ত্রোচ্চারণ করে বর ও বধূর মিলন রূপ সংস্কারকে বিবাহ বলে।
সনাতন ধর্ম অনুসারে বিবাহের কতকগুলো বিধি-বিধান শাস্ত্রীয়, কতকগুলো লৌকিক ও স্ত্রী আচার। বিবাহ স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পবিত্র বন্ধন যাপন করে। বিবাহের দ্বারা দুটি নর-নারীর জীবন এক সূত্রে বাঁধা পড়ে। একজন হয় আরেক জনের সুখ-দুঃখের সাথী। বিবাহ হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের বন্ধন স্থাপনের পবিত্র ও বৈধ উপায়। তাই তো বিবাহে উচ্চারিত একটি মন্ত্র:

যদেতৎ হৃদয়ং তব
তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম
তদস্তু হৃদয়ং তব।

অর্থাৎ তোমার হৃদয় আমার হোক,
আমার হৃদয় হোক তোমার।

মরণোত্তর কৃত্য

জন্ম গ্রহণ করলে মৃত্যু হবেই। তাই কেউ মারা গেলে মরণোত্তর কৃত্য পালন করা হয়। সনাতন ধর্ম অনুসারে মরণোত্তর কৃত্যের মধ্যে রয়েছে :

ক. অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া
খ. অশৌচ পালন
গ. শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

ক. অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া

দেহ থেকে আত্মা অন্তর্হিত হলে দেহ একটি অচল পদার্থে পরিণত হয়। ক্রমে ক্রমে এটি পচে যায়। তাই শাস্ত্রে মৃতদেহ সৎকারের বিধান দেওয়া হয়েছে। এ সৎকারই অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া নামে পরিচিত।

সনাতন ধর্মাবলম্বীরা মৃতদেহকে অগ্নিতে দাহ করেন। বিশেষ ক্ষেত্রে মুখাগ্নি করার পর সমাধিস্থ করা হয়। তবে তা বিরল। মৃতদেহ দাহ করাই বহুল প্রচলিত প্রথা। দাহ করার সময় সনাতন ধর্মের বিধান অনুযায়ী মন্ত্র ও পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

অশৌচ পালন

'অশৌচ' বলতে বোঝায় শুচিতার অভাব। মাতা-পিতা বা জ্ঞাতিদের কেউ মারা গেলে আমরা শোকে আকুল হই। আমাদের মন সাধন-ভজনের উপযোগী থাকে না। তখন আমরা অশুচি হই।

এ অবস্থা কাটতে সময় লাগে। তাই সনাতন ধর্ম অনুসারে অশৌচ পালন করতে হয়। বর্ণ অনুসারে অশৌচ পালনের দিবস সংখ্যায় তারতম্য দেখা যায়। এটা একালে বাঞ্ছনীয় নয় বলেই মনে করি। সকল বর্ণের অশৌচ পালনের দিবস সংখ্যা সমান হওয়া যুক্তিসঙ্গত ও বাঞ্ছনীয়।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

'শ্রদ্ধা' শব্দটি থেকে শ্রাদ্ধ শব্দটি এসেছে। অশৌচ কাল শেষ হলে তার পরের দিন শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করণীয়। মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে দান করা হয় এবং ভোজের ব্যবস্থা করা হয়।

পাঠসংক্ষেপ

কোনো বিশেষ মনস্কামনা পূরণের জন্য যে পূজা বা ধর্মানুষ্ঠান করা হয়, তার নাম ব্রত। যেমন– শিবরাত্রিব্রত, জন্মাষ্টমী ব্রত ইত্যাদি। যুগাগত প্রথানুসারে ধর্মাচারসমূহকে সংস্কার বলে। সংস্কার দশ প্রকার। কেউ মারা গেলে সনাতন ধর্মানুসারে তার মৃহদেহ সাধারণত দাহ করা হয়, তারপর অশৌচ পালন করা হয় এবং সর্বশেষে শ্রাদ্ধ করা হয়। মৃত্যুর পরেকার এ কৃত্যসমূহকে বলা হয় মরণোত্তর কৃত্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১৬.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিনঃ

১. বিশেষ মনস্কামনা পূরণের জন্য যে পূজা বা ধর্মানুষ্ঠান করা হয় তাকে কী বলে?
   ক. নিত্যকর্ম খ. ব্রত গ. পার্বণ ঘ. নৈমিত্তিক কর্ম
২. সনাতন ধর্মানুসারে প্রধান সংস্কার কয়টি?
   ক. পাঁচটি খ. আটটি গ. দশটি ঘ. বারোটি
৩. সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার ঠিক পরেকার সংস্কারটি কী?
   ক. নামকরণ খ. জাতকর্ম গ. অন্নপ্রাশন ঘ. হাতে খড়ি

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ব্রত কাকে বলে?
২. সংস্কার বলতে কী বোঝেন?
৩. সংস্কার কয়টি ও কী কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ব্রত বলতে কী বোঝায়? দৃষ্টান্তসহ বুঝিয়ে লিখুন।
২. ব্রত পালনের উদ্দেশ্য কী? বুঝিয়ে লিখুন।
৩. সংস্কার কাকে বলে? বিবাহ সংস্কারের পরিচয় দিন।

পাঠ-৮ : বাংলাদেশে সনাতন ধর্মের রূপ ও সাংস্কৃতিক অবদান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশে সনাতন ধর্মের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক চর্চা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশে সনাতন ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে সনাতন ধর্মের অবদান সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ধর্মচর্চা

বাংলাদেশে সনাতন ধর্মাবলম্বী হিন্দু সম্প্রদায় দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় সম্প্রদায়। একজন সনাতন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগত ভাবে সন্ধ্যা-আহ্নিক প্রভৃতি নিত্যকর্ম তথা উপাসনা, একাদশীর উপবাস, ব্রত পালন, পূজায় অঞ্জলি প্রদানসহ নানাভাবে ধর্মচর্চা করে থাকেন। এ ছাড়া অনেকেই শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাও নিত্য পাঠ করে থাকেন। এ ছাড়া তাঁরা তীর্থ ভ্রমণে পুণ্য হয় এ ধর্মাদর্শ স্মরণে রেখে পবিত্র তীর্থসমূহ ভ্রমণ করে থাকেন।

পারিবারিকভাবেও সনাতন ধর্মের নিয়মিত চর্চা করা হয়। প্রতি বৃহস্পতিবার ঘরে ঘরে লক্ষ্মীপূজা করা হয়। প্রতি শনিবার শনি পূজা করা হয়। প্রতিটি পরিবারে ছোট আকারের বা বড় আকারের মন্দির থাকে। মন্দির না থাকলে ঘরের ভেতরে ঠাকুরের আসন পাতা থাকে এবং নিয়মিত পূজা দেওয়া হয়। এ ছাড়া মনসা পূজা, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতী পূজা, শিবরাত্রির ব্রত প্রভৃতিও পারিবারিকভাবে করা হয়। কোনো কোনো বাড়িতে দুর্গাপূজাও পারিবারিকভাবে করা হয়।

বাংলাদেশে সনাতন ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা

বাংলাদেশে সামাজিকভাবে সনাতন ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে।

গ্রামে গ্রামে সার্বজনীনভাবে দেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। সেখানে দুর্গাপূজা, কালী পূজা, সরস্বতী পূজা ও জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠান সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়।

এছাড়া বছরের বিভিন্ন সময়ে বিশেষ করে শীত ও বসন্ড়কালে চার প্রহর থেকে শুরু করে অষ্টপ্রহর, ষোল প্রহর – চৌষট্টি প্রহরব্যাপী হরিনাম কীর্তন করা হয়। কীর্তনের পরে মহোৎসব করে নিরামিষ ভোজন করা হয়।

ধর্মানুষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশের সনাতন ধর্মাবলম্বীরা বেশ কিছু কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলেছেন। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর শাখা প্রতিষ্ঠানও সারা দেশে ছড়িয়ে আছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে কয়েকটির উল্লেখ করছি:

১. শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন

স্বামী বিবেকানন্দের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রধান কেন্দ্র পশ্চিম বঙ্গের বেলুড়ে। এ প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন দেশে সনাতন ধর্মের ধর্মচর্চা করে চলেছে। বাংলাদেশেও ঢাকা শহরে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন রয়েছে। এর নিয়ন্ত্রণে ও নেতৃত্বে সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে রামকৃষ্ণ মিশন বা বিবেকানন্দ সংঘ ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। এ সকল প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারায় সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শের অনুসরণে ধর্মচর্চা ও ধর্মানুষ্ঠান করে আসছে। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে দূর্গাপূজার সময়ে মাতৃভক্তি হিসেবে আদ্যাশক্তি মহামায়ার অংশ হিসেবে কুমারী পূজা করা হয়। এ ছাড়া এ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটি হযরত মুহম্মদ (সঃ), যীশুখ্রিষ্ট ও গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে।

২. আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন)

প্রভুপাদ অভয়াচরণ ভক্তিবেদান্ততীর্থ শ্রীচৈতন্যের ভাবধারায় আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছেন। সারা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এর শাখা আছে। বাংলাদেশেও এ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নিজস্ব পদ্ধতিতে সনাতন ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা করে চলেছে।

৩. শ্রীশ্রী লোকনাথ মন্দির ও আশ্রম

ব্রহ্মভূত শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী বারদীতে যে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা আজ সারা বিশ্বে বিস্তৃত হয়ে গেছে। কবিরাজ মথুরানাথ চক্রবর্তী ঢাকার স্বামীবাগে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শ্রীশ্রী লোকনাথ মন্দির ও শক্তি ঔষধালয়। লোকনাথ মন্দিরসমূহ নিজস্ব ধারায় সনাতন ধর্মের চর্চা করে আসছে।

৪. মহাপ্রকাশ মঠ ও মহানাম সম্প্রদায়

প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের ভাব শিষ্য শ্রীমন্ মহেন্দ্রজী এবং তদীয় শিষ্য শ্রীমন্ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহাপ্রকাশ মঠ এবং মহানাম সম্প্রদায় নামে বিশাল প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানটি ফরিদপুর জেলা শহরে প্রতিষ্ঠিত– শ্রীধাম ও শ্রীঅঙ্গন বলে পরিচিত। সনাতন ধর্মীয় এ প্রতিষ্ঠানটিও নিয়মিত ধর্মচর্চা-ধর্মানুষ্ঠান করে আসছে।

৫. ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত সৎসঙ্গ

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেছেন সৎসঙ্গ। পাবনা জেলার হিমায়েত পুরে। টাঙ্গাইল জেলার তাকুটিতেও এ প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে যাচ্ছে। দেওঘরেও এ সৎসঙ্গের বিশাল প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সারা বাংলাদেশে এবং ভারতে এ প্রতিষ্ঠানটির অনেক শাখা রয়েছে।

৬. স্বামী স্বরূপানন্দ প্রতিষ্ঠিত অযাচক আশ্রম ও অখন্ডমন্ডলী

স্বামী স্বরূপানন্দ কুমিল্লা জেলার রহিমপুরে এবং চাঁদপুরে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন অযাযক আশ্রম এবং অখন্ডমন্ডলী নামক সনাতন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। 'ওঙ্কার' কে সামনে রেখে অখন্ডমন্ডলীর সদস্যরা ধর্মচর্চা করেন। কারও কাছ থেকে যাচ্ঞা করে বা চেয়ে কোনো দান-অনুষ্ঠান নেন না - তাই তো তাঁদের আশ্রমের নাম অযাচক আশ্রম। চরিত্র গঠন এবং ওঙ্কার সাধনা এ প্রতিষ্ঠানের মূলমন্ত্র।

৭. স্বামী প্রণবানন্দ প্রতিষ্ঠিত ভারত সেবাশ্রম

বৃহত্তম ফরিদপুরের অন্তর্গত বর্তমান মাদারীপুর জেলার বাজিতপুরে অবিভক্ত ভারতবর্ষে স্বামী প্রণবানন্দের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারত সেবাশ্রম। বাংলাদেশে এ প্রতিষ্ঠানটির নাম বাংলাদেশ সেবাশ্রম। বিভিন্ন তীর্থস্থানে এ প্রতিষ্ঠানের সেবা কার্যক্রম প্রশংসনীয়।

৮. শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবধারায় নিজস্ব পদ্ধতিতে সনাতন ধর্মের চর্চা করে যাচ্ছে শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ। ঢাকার নারিন্দায় এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত।

৯. হরিচাঁদ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত মতুয়া সম্প্রদায়

এ প্রতিষ্ঠানটিও নিজস্ব ধারায় সনাতন ধর্মের চর্চা করে আসছে। গোপালগঞ্জ জেলার ওড়াকান্দিতে এর কেন্দ্রীয় হরিমন্দির প্রতিষ্ঠিত। এছাড়া বাংলাদেশের এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে মতুয়া সম্প্রদায় হরিমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সনাতন ধর্ম চর্চা করে যাচ্ছেন।

১০. ঋষি অরবিন্দের ভাব ধারায় বাংলাদেশেও ধর্ম প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তাঁরাও তাঁদের মতো করে সনাতন ধর্মের চর্চা করে যাচ্ছেন।

উদাহরণ হিসেবে আমরা মাত্র সনাতন ধর্মের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কথা বললাম। এর বাইরেও অনেক প্রতিষ্ঠান সনাতন ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা করে আসছে।

সনাতন ধর্ম চর্চার ক্ষেত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে সচেতন ও বলিষ্ঠ অবদান রেখে চলেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে প্রতিবছর দুর্গাপূজার সময় বিভিন্ন মন্দিরে অনুদান প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ টেলিভিশনে দুর্গাপূজা, জন্মষ্টমী, মহালয় উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জন্মাষ্টমী ও দুর্গাপূজা উপলক্ষে সনাতন ধর্মীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণট্রাস্ট

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত হয়ে আসছে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট। মঠ, মন্দির ও শ্মশান প্রতিষ্ঠা ও সংস্কারে অনুদান প্রদান, দুর্গাপূজা উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে মঞ্জুর করা অনুদান বিতরণ, হিন্দু সম্প্রদায়ের কল্যাণে কর্মসূচি গ্রহণ প্রভৃতিও ট্রাস্টের কর্মধারার অন্তর্গত।

এ ছাড়া ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে 'মন্দির ভিত্তিক শিশু ও বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প' নামে একটি প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণট্রাস্ট এক্ষেত্রে ধর্মমন্ত্রণালয়ের পক্ষে ক্রিয়াশীল।

কোথাও দুবৃত্তদের দারা ধর্মীয় মতান্ধতায় কোনো সাম্প্রদায়িক শান্তি ও শৃঙ্খলার বিঘ্ন ঘটলে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ জানামাত্র ধর্মমন্ত্রণালয়কে অবহিত করে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

এ বছর (২০১২) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনায় জেলা প্রশাসনের আয়োজনে চৌষট্টিটি জেলায় জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের স্মরণোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

এছাড়া কিছু সংগঠন আছে, যেগুলো সারা দেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সনাতন ধর্মের চর্চায় আত্মনিবেদিত। উদাহরণ হিসেবে মাত্র কয়েকটির নাম বলছি :

ক. বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ
খ. বাংলাদেশ হিন্দুসমাজ সংস্কার সমিতি
গ. শ্রীগীতা সংঘ
ঘ. শ্রী গুরু সংঘ
ঙ. বিবেকানন্দ শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিষদ
চ. লোকনাথ সেবা সংঘ
ছ. শ্রীচৈতন্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংঘ
জ. শ্রী শ্রীহরিচাঁদ শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিষদ ইত্যাদি।

বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে সনাতন ধর্মের অবদান

সনাতন ধর্ম সকল ধর্মকেই সত্য মনে করে। সকল ধর্মের প্রতিই শ্রদ্ধাশীল। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন:

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥

(৪/১১)

– হে পার্থ (অর্জুন), যে আমাকে যে-ভাবে উপাসনা করে, আমি তাকে সেভাবেই তুষ্ট করি। মনুষ্যগণ সর্বপ্রকারে আমার পথেরই অনুসরণ করে।

বাংলাদেশের সনাতন ধর্মাবলম্বীরা শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার এ বাণী সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে। পরমত সহিষ্ণুতা ও গণতান্ত্রিক চেতনা সনাতন ধর্মের অঙ্গীভূত। ধর্মীয় সম্প্রীতি ও জাতীয় সংহতিতে সনাতন ধর্মের এ চিন্ড্রর অবদান রয়েছে।

জীবে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর জ্ঞান সনাতন ধর্ম দর্শনের আরেকটি ভিত্তি। জীবকে ঈশ্বর জ্ঞান করলে নির্যাতন করার প্রশ্নই ওঠে না। আর এ সনাতন ধর্মদর্শন মানবতার আদর্শ, সমতা ও সহমর্মিতার আদর্শ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

সর্বজনীন পূজা ও সংকীর্ত্তন উৎসবে সকল ধর্মের লোকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়, এর মধ্য দিয়ে ধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে ওঠে, গড়ে ওঠে জাতীয় সংহতি।

সনাতন ধর্মে বলা হয়েছে – 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' – মা ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

এ চেতনা থেকে মাতৃভক্তি ও দেশপ্রেম জাগ্রত হয়। এ জাগ্রত দেশপ্রেম নিয়েই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সনাতন ধর্মাবলম্বীরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে।

সঙ্গীতকে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা ধর্মচর্চার অন্যতম পথ বলে মনে করে। তাই সনাতন ধর্মাবলম্বীরা সঙ্গীত চর্চাকে খুবই গুরুত্ব দেয়। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

– এ ষোল নাম কীর্তন বিভিন্ন সুরে ও তালে গীত হয়। এর মধ্য দিয়ে সঙ্গীত চর্চার প্রসার ঘটে। জাতীয় সাংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ চর্চার প্রভাব রয়েছে।

পূজার আলপনা আজও ঐতিহ্যবাহী লোক সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছে। মূর্তি শিল্পের মধ্য দিয়ে চিত্র ও ভাস্কর্য শিল্পের উৎকর্ষ সাধিত হচ্ছে। কান্তজির মন্দিরসহ ঐতিহ্যবাহী মন্দির ও মঠের শিল্পকর্ম জাতীয় ও আন্ড়র্জাতিকভাবে প্রশংসিত।

সুতরাং বাংলাদেশে সামাজিক ও জাতীয় সংহতি এবং জাতীয় সংস্কৃতির বিনির্মাণ ও বিকাশে সনাতন ধর্ম বলিষ্ঠ অবদান রেখেছে এবং রেখে চলেছে।

পাঠসংক্ষেপ

বাংলাদেশে সনাতনধর্মাবলম্বীরা ব্যক্তিগত ভাবে জপ-তপ- পূজা প্রভৃতির মাধ্যমে উপাসনা করেন। পুণ্যতীর্থসমূহ ভ্রমণ করেন। পারিবারিকভাবেও বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করা হয়।

সামাজিকভাবে সার্বজনীন পূজা, হরিনাম সংকীর্তন ও ধর্মীয় আলোচনা সভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সরকারিভাবে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণট্রাস্ট সনাতনধর্মাবলম্বীদের কল্যাণে নানা কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, আন্ড়র্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন), লোকনাথ মন্দির ও আশ্রম, মহাপ্রকাশ মঠ, সৎসঙ্গ, অখন্ডমন্ডলী, মুতুয়া সম্প্রদায়, বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে সনাতন ধর্মের চর্চায় কাজ করে যাচ্ছে।

সনাতন ধর্মের পরমত সহিষ্ণুতার আদর্শ, সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, জীবসেবার আদর্শ এবং সঙ্গীতশিল্প ও ভাস্কর্য শিল্পের চর্চা বাংলাদেশের সংস্কৃতিতেও অবদান রেখে চলেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৬.৮

সঠিক উত্তরের পাশে (√) চিহ্ন দিন:

১. ধর্ম চর্চার অঙ্গ হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে কোনটি করা হয়?
   ক. সন্ধ্যা-আহ্নিক খ. সংকীর্তন
   গ. দুর্গাপূজা ঘ. হরিসভা

২. রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠায় কে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন?
   ক. শ্রীরামকৃষ্ণ খ. স্বামী বিবেকানন্দ
   গ. স্বামী অভেদানন্দ ঘ. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

৩. শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্রম বাংলাদেশের কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?
   ক. স্বামীবাগ খ. সীতাকুন্ড
   গ. বারদী ঘ. রহিমপুর

৪. স্বামী স্বরূপানন্দ প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের নাম কী?
   ক. অখন্ড আশ্রম খ. অযাচক আশ্রম
   গ. সেবাশ্রম ঘ. পুণ্যাশ্রম

৫. ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নাম কী?
   ক. সেবক সঙ্গ খ. সাধু সঙ্গ
   গ. সৎ সঙ্গ ঘ. তরুণ সঙ্গ

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সনাতনধর্মাবলম্বী একজন ব্যক্তি ব্যক্তিপর্যায় কীভাবে ধর্মচর্চা করেন?
২. অযাচক শব্দটির অর্থ কী? অযাচক আশ্রম ও অখন্ডমন্ডলী সম্পর্কে লিখুন।
৩. শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রম কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়? এ আশ্রম সম্পর্কে আপনার নিজস্ব মন্তব্য লিখুন।
৪. 'সৎ সঙ্গে'র প্রতিষ্ঠাতা কে? সৎ সঙ্গের কর্মধারা সম্পর্কে তিনটি বাক্য লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সনাতন ধর্মচর্চায় শ্রী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন'– শীর্ষক একটি অনুচ্ছেদ রচনা করুন।
২. টীকা লিখুন:
   ক. হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
   খ. আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনাকৃত সংঘ
৩. বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে সনাতন ধর্মচিন্তা ও কর্মধারার অবদানের বর্ণনা দিন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহু নির্বাচনি প্রশ্নসমূহের উত্তর

পাঠ-১ : ১(ক), ২(খ), ৩(ঘ), ৪(ঘ), ৫(গ) ৬(গ) ৭(গ)।
পাঠ-২ : ১(ঘ), ২(ক), ৩(ঘ), ৪(ক), ৫(গ)।
পাঠ-৩ : ১(গ), ২(ঘ), ৩(গ), ৪(ঘ), ৫(গ)।
পাঠ-৪ : ১(ঘ), ২(গ), ৩(ঘ) ৪(গ), ৫(খ)।
পাঠ-৫ : ১(খ), ২(গ), ৩(খ), ৪(ঘ), ৫(খ), ৬(গ), ৭(ঘ)।
পাঠ-৬ : ১(খ), ২(ক), ৩(ক), ৪(খ), ৫(ঘ)।
পাঠ-৭ : ১(খ), ২(গ), ৩(খ)।
পাঠ-৮ : ১(ক), ২(খ), ৩(গ), ৪(খ), ৫(গ)।